জীবন-বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ



ডক্টর হরিদাস গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ প্রবর্তিত ১৯৭৫ সাল হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের অবশ্যপাঠ্য জীবন-বিজ্ঞানের সপ্তম শ্রেণীর নূতন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত

জীবন-বিজ্ঞান

[দ্বিতীয় ভাগ ঃ সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

ডক্টর হরিদাস গুপ্ত, এম্.এস্.-সি., ডি.ফিল্.,

অধ্যক্ষ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী,
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, জীব-বিজ্ঞান ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ ;
ভূতপূর্ব জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, মণিমালা গার্লস কলেজ
(অধুনা 'মহিলা কলেজ'), আসানসোল

এবং

জীব-বিজ্ঞান প্রবেশ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), জীব-বিজ্ঞান প্রয়োগ সমীক্ষা (১ম ও ২য় খণ্ড), জীব-বিজ্ঞান (পি. ইউ.), *Practical Zoology* (B.Sc.), বিজ্ঞানভারতী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রভৃতি
বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা ;
কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ;
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কাউনসিলের সভ্য।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
কে. বসু,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭

Paper used for printing of this book was made available by the Govt. of India at a concessional rate.

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৪
মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৭৫
মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৫

মূল্য : টা. ২·৮০

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা-৬

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE

CLASS VII—80 pages

(Suitably illustrated, printing Pica type, size of the book 1/16 Double Demy. Size of the diagram 3″ × 2″ minimum)

(1) Plant and Animal kingdom :—
Study of plant and animal groups with spot identifying characters and acquaintance through demonstration of actual specimens. (10 pages)

(2) External structure :—
(a) Plant—root, stem, leaf and their modifications. Types of flowers, fruits and seeds. (b) Animal—fish, toad, lizard, bird, mammal, cockroach, butterfly and snail. (30 pages)

(3) Germination of seeds :—
Condition of germination with experiments. (3 pages)

(4) Outline knowledge of :—
(a) Economic plants :—cereals, pulses, jute, cotton, sal, cocoanut and mustard. (7 pages)
(b) Economic animals :—Silk-worm, fish, poultry bird, and cow. (6 pages)

(5) General idea in outline about food—carbohydrate, fat & protein. (6 pages)

(6) Outline knowledge of :—
(a) Medicinal plants—Penicillium, Sarpagandha (Rauwolfia Serpentina), Dhutura. (4 pages)
(b) Pest and disease producing animals—fly, mosquito, rat. (4 pages)

(7) Demonstration by actual specimens and where specimens are not available by models and charts of the various items mentioned in the course content. Students should be encouraged to collect specimens and perform suitable experiments wherever possible. (10 pages)

সূচীপত্র

জীবন-বিজ্ঞান

[দ্বিতীয় ভাগ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী (**Plant and Animal**)

'জীবন-বিজ্ঞান'-এর প্রথম ভাগে নানারকমের গাছপালা ও জীব-জন্তুর কথা বলা হয়েছে। এইসব গাছপালা কি-ভাবে চেনা যায় ও তাদের চিনতে হলে কি কি লক্ষণের দিকে নজর রাখতে হবে, তারও কিছু কিছু, আগেই বলা হয়েছে। অণুবীক্ষণের তলায় এককোষ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ বা প্রাণীদের দেখা যায়। এইভাবে দেখে তাদের প্রত্যেকের লক্ষণগুলি চিনে নেওয়া হয়। এককোষী থেকে বহুকোষী উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সমন্বয়ে পৃথিবীর বুকে রয়েছে বিচিত্র প্রাণসমুদ্র। মানুষ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের চিনে নিয়ে ও কাজে লাগিয়ে মানবজাতির নানা প্রয়োজন মেটায়। জীবন-বিজ্ঞানীরা তাই বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী তাদের নানা ভাবে সাজিয়েছেন। বিবর্তন অনুসারে সাজানোকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'শ্রেণীবিভাগ করা'। এই শ্রেণীবিভাগে প্রতিটি উদ্ভিদ্ বা প্রাণী চিহ্নিত করা হয়েছে ও তাদের এক-একটি বিজ্ঞান-সম্মত সর্বদেশীয় নাম দেওয়া হয়েছে।

উদ্ভিদ্-জগতের শ্রেণীবিভাগ

(**Classification of Plants**)

উদ্ভিদের আকৃতি, বহির্গঠন, অন্তর্গঠন প্রভৃতি ভালোভাবে দেখে উদ্ভিদ্-জগৎকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ফুল উদ্ভিদের একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ফুল যে-সব উদ্ভিদে থাকে, তাদের **সপুষ্পক উদ্ভিদ্** (*Phanerogam*) এবং যে-সব উদ্ভিদে ফুল থাকে না, তাদের **অপুষ্পক উদ্ভিদ্** (*Cryptogam*) বলা হয়। অপুষ্পক উদ্ভিদ্ বিবর্তনের ধারা অনুযায়ী আদিম ও নিম্নশ্রেণীর এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ্ উচ্চশ্রেণীর বা উন্নত ধরনের বলা যায়। পৃথিবীর বুকে অপুষ্পকের সৃষ্টিই আগে হয়েছে

ও তাদের থেকেই সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে। অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভক্তিও বিবর্তন বা অভিব্যক্তিক্রম অনুযায়ী হওয়ায়, প্রথম ভাগের উদ্ভিদ্‌গুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নিম্নশ্রেণীর। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম এদেরই উৎপত্তি হয়েছিল।

১। **থ্যালোফাইটা** (**Thallophyta :** Thallus = undifferentiated ; phyton = plant) : থ্যালোফাইটা-জাতীয় উদ্ভিদ্ সবচেয়ে পুরোনো ও খুবই সরল। এদের এককোষী থেকে আরম্ভ ক'রে বহুকোষী পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এদের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। এই আকারবিহীন দেহে পাতা, মূল বা কাণ্ড কিছুই থাকে না। থ্যালোফাইটা-জাতীয় উদ্ভিদ্‌কে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

(ক) **শৈবাল বা অ্যালজী** (*Algae*) : এদের দেহের রঙ সবুজ। ক্লোরোফিল নামে একরকমের সজীব পদার্থ এদের দেহের মধ্যে থাকে এবং ক্লোরোফিলের রঙ সবুজ হওয়ায় শৈবালের দেহের রঙও সবুজ। শৈবাল নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করে। এই উদ্ভিদ্‌কে **স্বভোজী** (*Autophyte*) বলা হয়। এদের কোষের প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে তৈরি। **স্পাইরোগাইরা** (*Spirogyra*), **ভাউকেরিয়া** (*Vaucheria*) প্রভৃতি সাধারণ শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ্ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।



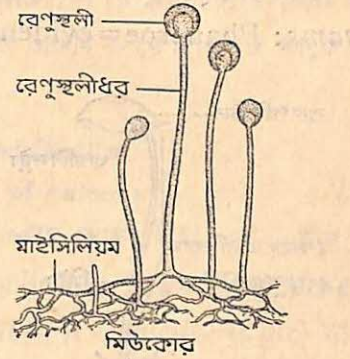
১নং চিত্র

(খ) **ছত্রাক** (*Fungi*) : এইজাতীয় উদ্ভিদের আকার নানারকমের এবং দেখতে সবুজ ব্যতীত অন্যান্য রঙের হয়। এদের দেহে ক্লোরোফিল না থাকায়, এরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। জৈব ও অজৈব পচনশীল রাসায়নিক পদার্থের ভেতর থেকে এই শ্রেণীর উদ্ভিদ্ খাদ্য শোষণ ক'রে জীবনধারণ করে। তাই এদের পরভোজী

(*Heterophyte*) বলা হয়। এরা সাধারণতঃ **পরজীবী** (*Parasite*) ও **মৃতজীবী** (*Saprophyte*) উদ্ভিদ্ নামে পরিচিত। পচা ফলের উপর সাদা



২নং চিত্র



৩নং চিত্র

তুলোর মতো ছত্রাক-জাতীয় সজীব উদ্ভিদ্ জন্মায়। **ব্যাঙের ছাতা** (*Agaricus*), **মিউকর** (*Mucor*), **ঈস্ট** (*Yeast*), **পেনিসিলিয়ম** (*Penicillium*) ইত্যাদি উদ্ভিদ্ ছত্রাক-শ্রেণীর অন্তর্গত।

২। **ব্রাওফাইটা বা মস্-জাতীয় উদ্ভিদ্ (Bryophyta :** bryon = moss) ঃ বিবর্তন বা অভিব্যক্তির ধারা অনুসারে উদ্ভিদ্-জগতে থ্যালোফাইটার পর ব্রাওফাইটা বা মস্-জাতীয় উদ্ভিদের স্থান। এরা স্থলজ ও আর্দ্র স্থানে জন্মায়। উচ্চশ্রেণীর ব্রাওফাইটার কাণ্ড ও পাতা থাকে, কিন্তু মূল থাকে না। মূলের পরিবর্তে, কাণ্ডের নিচে রাইজয়েড নামে এককোষী বা বহুকোষী রোম জন্মায়। **রিক্সিয়া** (*Riccia*), **মারকেন্সিয়া** (*Marchantia*), **ফুনেরিয়া** (*Funaria*) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ব্রাওফাইটা বা মস্-জাতীয়।

৩। **টেরিডোফাইটা বা ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদ্ (Pteridophyta :** Pteris = feather) ঃ ব্রাওফাইটার পরই টেরিডোফাইটা বা ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদের স্থান। এরাও জলে ও আর্দ্র জায়গায় জন্মায়। এদের দেহ সাধারণতঃ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এদের দেহে ফুল জন্মায় না এবং পাতাগুলি **পক্ষল যৌগপত্র** (*Pinnate*

compound leaf)। **সেলাজিনেলা** (*Selaginella*), **ইকুইজিটম** (*Equisetum*) প্রভৃতি ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদ্ এই শ্রেণীভুক্ত। উপরোক্ত তিন রকমের উদ্ভিদ্ অপুষ্পক-জাতীয়। সেইভাবে **সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে** (*Phanerogams*: Phaneroe = evident) দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে; যথা—



মস্

৪নং চিত্র



ফার্ন

৫নং চিত্র

(ক) **ব্যক্তবীজী** (*Gymnosperms* : Gymnos = naked ; sperma = seed) : এই শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এরা ফুল ও বীজ ধারণ করে, কিন্তু ফুল থেকে কোন ফল হয় না। বীজগুলি চোখে দেখা যায়। **পাইন** (*Pine*), **বিলাতি ঝাউ** (*Cycad*) প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি উদ্ভিদ্ এই শ্রেণীভুক্ত।

(খ) **গুপ্তবীজী** (*Angiosperm* : Angeion = a vessel) : সব রকমের আধুনিক উদ্ভিদ্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের দেহ কাণ্ড, মূল ও পাতায় বিভক্ত করা যায় এবং এরা ফুল, ফল ও বীজ ধারণ করে। বীজগুলি সম্পূর্ণভাবে ফলের মধ্যে আবৃত থাকে। গুপ্তবীজ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্‌কে বীজের বীজপত্র (*Cotyledon*) অনুসারে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—**দ্বিবীজপত্রী** ও **একবীজপত্রী**।

দ্বিবীজপত্রী (*Dicotyledon* : Di = two ; Cotyledon = seed-leaf) : এইপ্রকার উদ্ভিদের বীজে দুটি ক'রে বীজপত্র থাকে ; যেমন—ছোলা, মটর, তেঁতুল, কুমড়া ইত্যাদি। **একবীজপত্রী** (*Monocotyledon* : mono = one) : এইরকমের উদ্ভিদের বীজে একটি ক'রে বীজপত্র থাকে ; যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, আখ ইত্যাদি।

প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগ

(General Classification of Animals)

সমস্ত প্রাণিজগৎকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যারা এককোষ-বিশিষ্ট, তাদের **এককোষী** (*Unicellular*) বলা হয় এবং যাদের দেহ বহুকোষে গঠিত, তাদের বলা হয় **বহুকোষী** (*Multicellular*) বা **মেটাজোয়া** (*Metazoa*)। বহুকোষী প্রাণীদের একটি বৈশিষ্ট্য দেখে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল দেহের **মেরুদণ্ড**। যে-সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড নেই, তাদের **অমেরুদণ্ডী** (*Invertebrate*) প্রাণী বলে। আর যে-সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া থাকে, তাদের **মেরুদণ্ডী** (*Vertebrate*) প্রাণী বলা হয়। আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শিরদাঁড়া থাকে না। এর পরিবর্তে একটি শক্ত বা নরম হাড় শরীরের পিঠের মাঝামাঝি লম্বালম্বিভাবে থাকে। এই নরম হাড়কে **নোটোকর্ড** (*Notochord*) বলা হয়। যে-সব প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পর্যন্ত এই ধরনের নোটোকর্ড শরীরের মধ্যে থাকে, তাদের আবার **আদ্য-কর্ডাটা** (*Lower Chordata*) বা **প্রোটোকর্ডাটা** (*Protochordata*) বলা হয়। নোটোকর্ড বা শিরদাঁড়া-যুক্ত প্রাণীদের একটি বিশাল পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে কর্ডাটা (*Chordata*)। এককোষী প্রাণীদের নিয়ে একটিমাত্র পর্ব গঠিত হয়েছে। অমেরুদণ্ডী বহুকোষী প্রাণীদের মোটামুটি তেরোটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে।

নিচে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের রূপরেখা দেওয়া হ'ল :

এককোষী প্রাণী (Unicellular Animals)

পর্ব : **আদ্যপ্রাণী** বা **প্রোটোজোয়া** (*Protozoa* : Gr. Protos = first ; Zoon = animal) : এই পর্বের প্রতিটি প্রাণীর দেহে একটিমাত্র

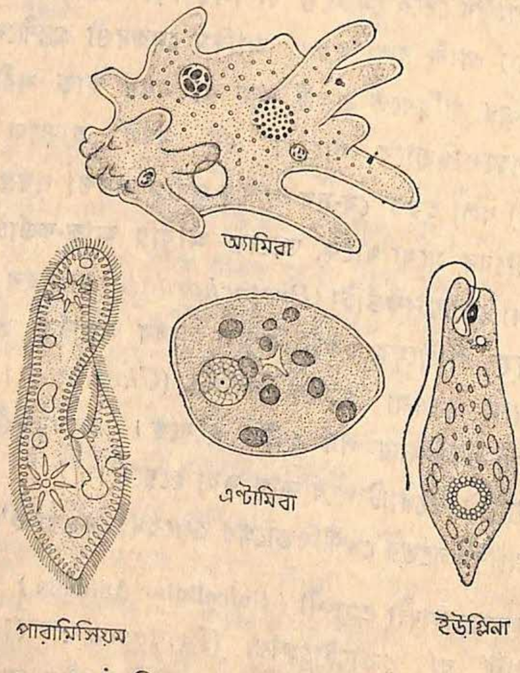
কোষ থাকে। এরা সাধারণতঃ আকারে আণুবীক্ষণিক (Microscopic)। দেহের প্রতিটি কোষে একটি ঘন পদার্থ বা নিউক্লিয়স থাকে। দেহ চটচটে সজীব প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। একটিমাত্র কোষ দিয়েই প্রাণী তার খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা অর্থাৎ জীবের বাঁচার জন্য সবরকমের বিপাকীয় কাজ করে।

আদ্যপ্রাণী পর্বকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে :

প্রথম শ্রেণী : **ম্যাসটিগোফোরা** (*Mastigophora*)—এদের দেহের সামনের দিকে সজীব সুতোর মতো চাবুক বা ফ্লাজেলা থাকে। উদাহরণ : **ইউগ্লিনা, লিস্‌মানিয়া, ট্রাইপ্যানোসোমা** ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণী : **সারকোডিনা** (*Sarcodina*)—এরা সর্বদা ক্ষণপদ বের ক'রে দেহের আকার পরিবর্তন করে। উদাহরণ : **অ্যামিবা, এণ্টামিবা** (আমাশয়ের জীবাণু)।

তৃতীয় শ্রেণী : **স্পোরোজোয়া** (*Sporozoa*)—এদের দেহগঠন



৬নং চিত্র—প্রোটোজোয়া পর্বের প্রাণী।

খুবই সরল, কিন্তু এদের জীবন-চক্র (*Life-cycle*) খুবই জটিল। এরা পরজীবী। উদাহরণঃ **মনোসিস্টিস্, প্লাস্মোডিয়ম** (ম্যালেরিয়ার জীবাণু)।

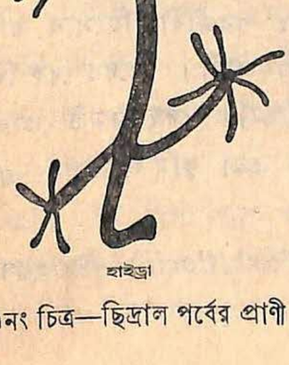
চতুর্থ শ্রেণী ঃ সিলিয়েটা (*Ciliata*)—এদের দেহের চারিধারে বেষ্টন ক'রে থাকে অসংখ্য সূক্ষ্ম রোম (*Cilia*)। এরা রোমের সাহায্যে চলা-ফেরা ও খাদ্য সংগ্রহ করে। উদাহরণঃ **প্যারামিসিয়াম, ভর্টিসিলা, ওপালিনা** ইত্যাদি।

মেটাজোয়া বা বহুকোষী প্রাণী

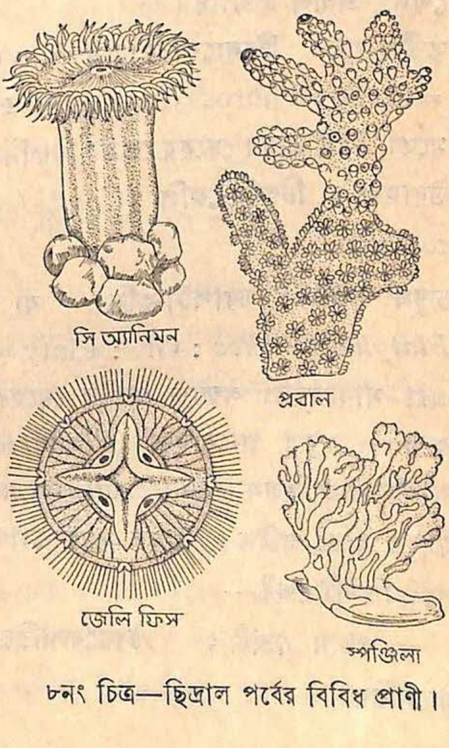
(Metazoa or Multicellular Animals)

অমেরুদণ্ডী বহুকোষী প্রাণীদের মোটামুটি তেরোটি পর্বে ভাগ করা হয়ঃ

প্রথম পর্বঃ পরিফেরা বা ছিদ্রাল প্রাণী (*Phylum Porifera* : Lat. : Porus = pore; ferre = to bear)—বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে



৭নং চিত্র—ছিদ্রাল পর্বের প্রাণী।



৮নং চিত্র—ছিদ্রাল পর্বের বিবিধ প্রাণী।

ছিদ্রাল প্রাণীর স্থান সর্বনিম্নে। এদের দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, সেইজন্য এদের 'ছিদ্রাল প্রাণী' বলা হয়। এরা অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে। স্পঞ্জ এর উদাহরণ।

দ্বিতীয় পর্বঃ একনালী-দেহী (*Phylum Cœlenterata*)—এদের আকার ফাঁপা নলের মতো। হাইড্রা ব্যতীত এই পর্বের অন্য সব প্রাণী সামুদ্রিক। নলের মতো দেহের এক প্রান্তে একটি ছিদ্র দেখা যায় এবং ছিদ্রের চারপাশে অতি সূক্ষ্ম লম্বা লম্বা সুতোর মতো কর্ষিকা (*Tentacle*) থাকে। এই ছিদ্রটি প্রাণীর মুখগহ্বর। এই পর্বের তিনটি শ্রেণী—

প্রথম শ্রেণীঃ **হাইড্রোজোয়া** (*Hydrozoa*)—উদাহরণঃ **হাইড্রা**, ওবেলিয়া, ফাইসেলিয়া, পরপিটা।

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ **স্কাইফোজোয়া** (*Scyphozoa*)—উদাহরণঃ **অরেলিয়া** (জেলিফিশ)।

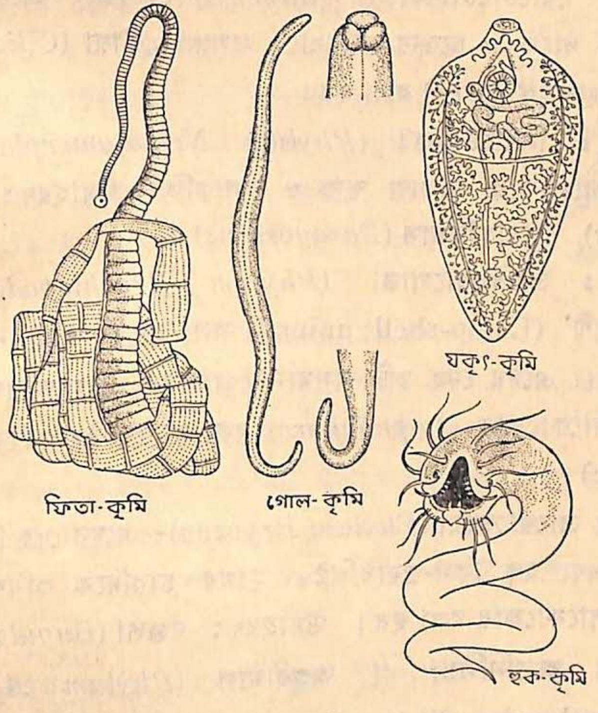
তৃতীয় শ্রেণীঃ **অ্যান্থোজোয়া** (*Anthozoa*)—উদাহরণঃ **সি**, পেন, প্রবাল ইত্যাদি।

তৃতীয় পর্বঃ টিনোফোরা (*Phylum Ctenophora* : Gr. : Ktenos = Comb ; Phoros = bearing)—এদের দেহ একনালী-দেহী প্রাণীদের মতো, কিন্তু এদের দেহের ভেতর চিরুনির মতো একটি অঙ্গ দেখা যায়। উদাহরণঃ **চিরুনি-জেলি** (*Comb-Jellies*), **সামুদ্রিক আখরোট** (*Sea-walnut*)।

চতুর্থ পর্বঃ চ্যাপটা-কৃমি বা প্লাটিহেলমিনথিস্ (*Phylum Platyhelminthes* : Gr. : Platy = flat ; helminthes = worm)—এরা সাধারণতঃ অন্যান্য প্রাণীর দেহের ভেতর পরজীবী হিসেবে বাস করে। কেবল **প্লানেরিয়া** (*Planaria*) স্বাধীনজীবী। এদের দেহ দ্বি-পার্শ্বরূপে প্রতিসম (*Bilaterally symmetrical*)। দেহ তিনটি কোষ-স্তরের দ্বারা গঠিত। এদের দেহ চ্যাপটা ও এরা কৃমি-জাতীয়। এই পর্বে তিনটি শ্রেণী—

প্রথম শ্রেণীঃ **টারবেলারিয়া** (*Turbellaria*)—উদাহরণঃ **প্লানেরিয়া**।

দ্বিতীয় শ্রেণী : ট্রিমাটোডা (*Trematoda*)—উদাহরণ : লিভার ফ্লুক (*Liver fluke*) ; রক্তকৃমি (*Blood fluke*)।



৯নং চিত্র—চ্যাপটা-কৃমি ও গোল-কৃমি জাতীয় প্রাণী।

তৃতীয় শ্রেণী : সেস্টোডা (*Cestoda*)—এদের দেহ বহু খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলিকে প্রোগ্লটিস্ (*Proglottis*) বলা হয়। এরা লম্বায় বারো হাত পর্যন্ত হয়। উদাহরণ : টেনিয়া সোলিয়ম বা ফিতা-কৃমি, টেনিয়া স্যাজিনাটা (*Taenia saginata*)।

পঞ্চম পর্ব : নিমাথেলমিন্থিস্ বা গোল কৃমি (*Phylum Nemathelminthes*: Gr. : Nematos = thread ; helminthos = worm) —এদের দেহ দ্বিপার্শ্বরূপে প্রতিসম এবং এদের দেহের ত্বক্ তিনটি স্তরে বিভক্ত। সবরকমের পরজীবী গোল-কৃমি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ : গোল-কৃমি বা অ্যাসকারিস্ (*Ascaris*), হুক-কৃমি (*Hook-worm*),

সুতা-কৃমি (*Thread-worm*), **গোদ-কৃমি** (*Filaria bancrofti*), **কুঁচো-কৃমি** (*Oxyuris vermicularis*)।

ষষ্ঠ পর্ব : রোটোটোরিয়া (*Phylum Rototoria*)—এদের মাথায় একটি চক্র থাকে ও চক্রের চারিধারে অসংখ্য রোঁয়া (*Cilia*) থাকে। এদের **রটিফার** (*Rotifer*) বলা হয়।

সপ্তম পর্ব : নিমাটোমর্ফা (*Phylum Nematomorpha*)—এদের আকৃতি গোলাকার, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নলাকৃতি। উদাহরণ : **গর্ডিয়াস** (*Gordius*), **প্যারাগর্ডিয়াস** (*Paragordius*)।

অষ্টম পর্ব : ব্রাকিয়োপোডা (*Phylum Brachiopoda*)—এদের 'প্রদীপ-প্রাণী' (Lamp-shell animal) বলা হয়। এরা নোনা জলে বাস করে। এদের দেহ দুটি অসমান খোলসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। এদের **লোফোফোর** (*Lophophore*) বলা হয়। উদাহরণ : **লিঙ্গুলা** (*Lingula*)।

নবম পর্ব : ব্রায়োজোয়া (*Phylum Bryozoa*)—এদের দেহ দ্বিপার্শ্বরূপে প্রতিসম এবং ত্বক্ তিন-স্তরবিশিষ্ট। মুখের চারদিকে কর্ষিকা থাকে। এদেরও লোফোফোর বলা হয়। উদাহরণ : **বগুলা** (*Bugula*)।

দশম পর্ব : অ্যানিলিডা বা অঙ্গুরীমাল (*Phylum Annelida*: L. Annulus = a little ring ; Gr. Eidos = form)—এদের দেহ লম্বা ও গোলাকার নলের মতো। দেহ অসংখ্য অঙ্গুরীর মতো দেহখণ্ডে বিভক্ত। এই পর্বের তিনটি শ্রেণী—

প্রথম শ্রেণী : আর্কিঅ্যানিলিডা (*Archiannelida*: Gr. : Arche = Primitive ; annulus = ring)—এদের সংখ্যা খুবই কম এবং প্রাচীনতম অঙ্গুরীমাল প্রাণী। উদাহরণ : **পলিগর্ডিয়াস** (*Polygordius*)।

দ্বিতীয় শ্রেণী : কিটোপোডা (*Chaetopoda*: L. : Chaeta = spine ; podos = foot)—এই শ্রেণীতে অনেক প্রাণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই শ্রেণীটিকে দুইটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বর্গের নাম **অলিগোকিটা**। উদাহরণ : সাধারণ মাটির কেঁচো (*Earthworm*)। দ্বিতীয় বর্গের নাম **পলিকিটা**। উদাহরণ : সামুদ্রিক কেঁচো। এদের মুখে

উপাঙ্গ থাকে ও প্রতি দেহখণ্ডে একজোড়া ক'রে পা দেখা যায়। পায়েও সূক্ষ্ম কাঁটা থাকে। উদাহরণঃ নেরিস।

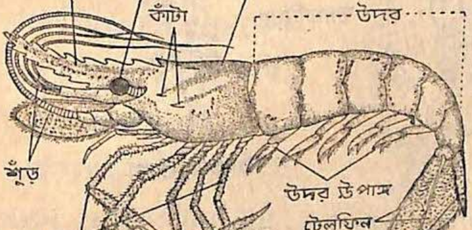
তৃতীয় শ্রেণীঃ হিরুডিনিয়া (*Hirudinea* : L. Hirudo = leech)—এদের মুখছিদ্রের ত্থ'পাশে চোয়াল থাকে এবং মুখছিদ্রটি একটি বিরাট চোষকের মধ্যে থাকে। পায়ুছিদ্রের ঠিক পেছনে সেইরকম আর একটা বিরাট চোষক (*Sucker*) থাকে। উদাহরণঃ জোঁক (*Leech*)।



১০নং চিত্র—অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণী।

একাদশ পর্বঃ সন্ধিপদ (*Phylum Arthropoda*)—নানা জাতের অসংখ্য কীট-পতঙ্গ এই পর্বের প্রাণী। এদের দেহে অনেকগুলি উপাঙ্গ (*Appendages*) থাকে। প্রতিটি উপাঙ্গ বহু খণ্ড যোগে গঠিত। তাই এদের **সন্ধিল উপাঙ্গ** (*Jointed appendages*) বলা হয়। এদের দেহের তিনটি অংশ—মাথা, বুক ও উদর; পর্বটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম শ্রেণীঃ ক্রাস্টেসিয়া (*Crustacea* : L. Crusta = a hard shell)—এদের মাথায় ত্নই জোড়া পাশাপাশি **শুঁড়** (*Antenna*) থাকে। উদর অংশের ত্নই পাশের উপাঙ্গগুলি **দ্বিবাহুবিশিষ্ট** (*Biramous*); চোখগুলি যৌগিক। উদাহরণঃ চিংড়ি, কাঁকড়া, স্কুইলা ইত্যাদি।

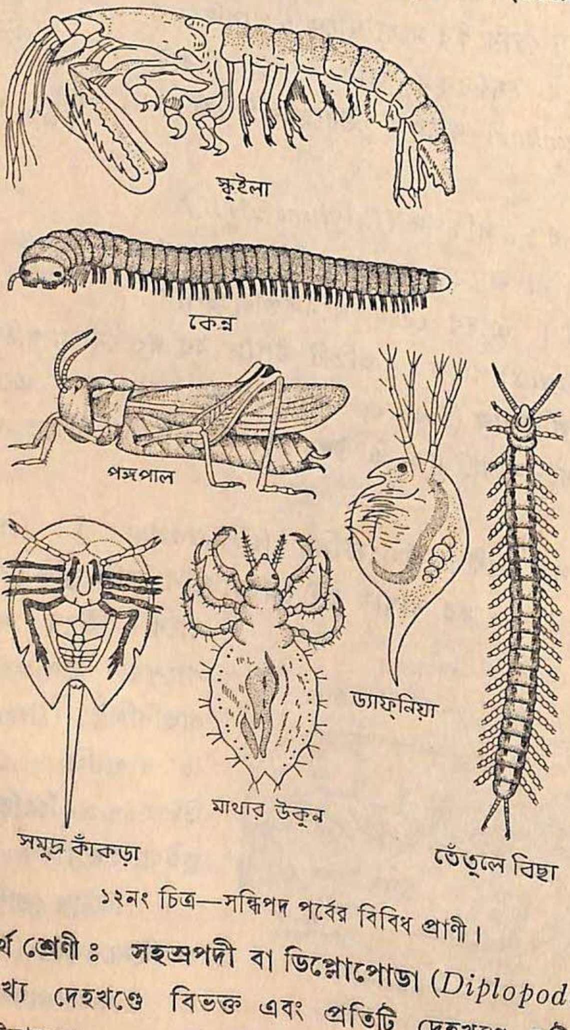


১১নং চিত্র—ক্রাস্টেসিয়ার চিংড়ি।

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ পতঙ্গ বা ইনসেক্টা (*Insecta* : L. Insectum = having been cut into)—এদের মাথায় ত্নই জোড়ার পরিবর্তে কেবল এক

জোড়া শুঁড় থাকে এবং বুক থেকে দুই জোড়া পাখনা বা ডানা ও তিন জোড়া পা থাকে। উদাহরণঃ মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীঃ শতপদী বা কিলোপোডা (*Chilopoda*)—এদের দেহ বেশ লম্বা ও চ্যাপটা। মাথার উপর একজোড়া শুঁড় থাকে। উদাহরণঃ তেঁতুলে-বিছে (*Scolopendra*), স্কুটিজেরা (*Scutigera*)।



১২নং চিত্র—সন্ধিপদ পর্বের বিবিধ প্রাণী।

চতুর্থ শ্রেণীঃ সহস্রপদী বা ডিপ্লোপোডা (*Diplopoda*)—এদের দেহ অসংখ্য দেহখণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি দেহখণ্ডে দুটি ক'রে পা থাকে। উদাহরণঃ কেন্নো (*Julus*)।

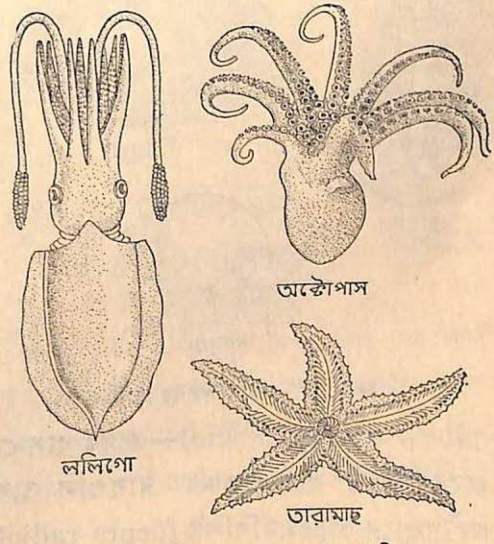
পঞ্চম শ্রেণী ঃ অ্যারাক্নিডা (*Arachnida* : Gr. : Aracne = spider ; eidos = form)—এদের মাথায় কোন শুঁড় নেই। দেহ সরু এবং মাথা, গলা, বক্ষ ও উদরে দেহটি বিভক্ত। বক্ষ-অঞ্চলে চারটি জোড়া-পদ বিদ্যমান। উদাহরণ ঃ মাকড়সা।

ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ ওনিকোফোরা (*Onychophora*)—এরা বহু প্রাচীন প্রাণী। এদের উপাঙ্গগুলির শেষে নখ (*Claw*) থাকে। মাথায় এদের একজোড়া শুঁড় থাকে। উদাহরণ ঃ পেরিপেটাস।

দ্বাদশ পর্ব ঃ শম্বুক বা মোলাস্কা (*Phylum Mollusca* : L. Mollis = soft)—এদের নরম ও মাংসল দেহ একটি চুন-জাতীয় খোলকের মধ্যে থাকে। সব শামুকই জলজ। এই পর্বের ছয়টি শ্রেণী—

প্রথম শ্রেণী ঃ অ্যাম্ফিনুরা (*Amphinura*)—এদের দেহের পিঠের দিকে আটটি খোলক পর পর সাজানো থাকে। উদাহরণ ঃ কাইটন (*Chiton*)।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ সোলেনোগ্যাস্টার (*Solenogaster*)—এদের দেহে চুন-জাতীয় খোলকের পরিবর্তে প্রচুর চুন-যুক্ত ছোট ছোট অসংখ্য কাঁটা (*Spicules*) থাকে। উদাহরণ ঃ কিটোডার্মা (*Chaetoderma*)।



১৩নং চিত্র—শম্বুক পর্বের প্রাণী।

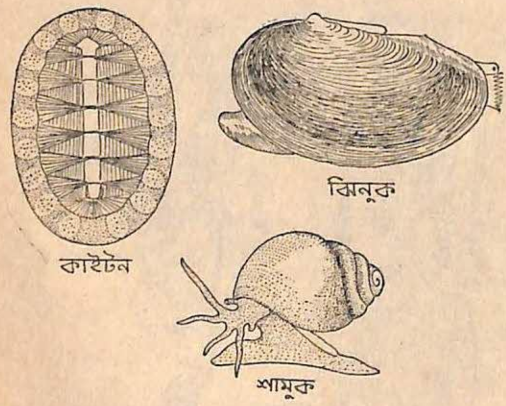
তৃতীয় শ্রেণী ঃ স্কাফোপোডা (*Scaphopoda*: Gr. : Skaphe = boat ; podos = foot) — এদের দেহ হাতির দাঁতের মতো খোলকের মধ্যে থাকে এবং এদের পায়ের গঠন

নৌকার মতো। উদাহরণ: **ডেন্টালিয়াম** (*Dentallium*), বা **টাস্ক-শেল** (*Tusk-shell*)।

চতুর্থ শ্রেণী: পেলিসাইপোডা বা বাইভাল্‌বিয়া (*Pelecypoda* : Gr. Pelecys = plough-like)—এদের দেহ দ্বি-খোলকবিশিষ্ট খোলসের মধ্যে থাকে। এদের পা-টি স্থূল ও লাঙলের ফলার মতো। উদাহরণ: ঝিনুক (*Oysters*)।

পঞ্চম শ্রেণী: উদরপদী বা গ্যাস্ট্রোপোডা (*Gastropoda* : Gr. : Gastros = stomach ; podos = foot)—এদের দেহ একটি প্যাঁচালো উচ্চ খোলকের মধ্যে আবদ্ধ। খোলকের মুখে একটি **ঢাকনা** (*Operculum*) থাকে। এদের মাথার উপর দুটি জোড়া **কর্ষিকা** (*Tentacles*) থাকে। উদাহরণ: **শামুক** (*Pila*)।

ষষ্ঠ শ্রেণী: মস্তকপদী বা সেফালোপোডা (*Cephalopoda*: Gr. Kephele = head)—এদের মাথা স্থূল, বৃহৎ ও স্পষ্ট। মাথার দুইপাশে একটি ক'রে বড় গোলাকার চোখ থাকে। মুখছিদ্রের চারপাশে আটটি বা দশটি চক্রাকার বাহু থাকে। উদাহরণ: **অক্টোপাস** (*Octopus*)।



১৪নং চিত্র—শম্বুক পর্বের প্রাণী।

ত্রয়োদশ পর্ব: কন্টকত্বক্‌ প্রাণী (*Phylum Echinodermata* : Gr. : Achinos = hedgehog spine ; dermos = skin)—এদের বাস নোনা জলে বা সমুদ্রে। দেহে এদের পাঁচটি বাহু থাকে। বাহুগুলি তারার মতো, দেহ থেকে পঞ্চ-অরীয়ভাবে প্রতিসমবিশিষ্ট (penta-radially symmetrical)। এদের ত্বকে প্রচুর কাঁটা ও শক্ত চুনের কঙ্কাল থাকে। পাঁচটি বাহুর ভেতর দিয়ে পাঁচটি অরীয় নালী থাকে। এই পর্বের পাঁচটি শ্রেণী—

প্রথম শ্রেণী ঃ অ্যাসটেরয়ডিয়া (*Asteroidea* : Gr. : Aster = star ; eidos = form)—এদের দেহ থেকে তারার মতো পাঁচটি বাহু বের হয়। উদাহরণ ঃ **তারা-মাছ** (*Star-fish*)।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অফিউরয়ডিয়া (*Ophiuroidea*)—এদের বাহুগুলি সরু সাপের লেজের মতো। উদাহরণ ঃ **অফিউরা** (*Brittle star*)।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ একাইনয়ডিয়া (*Echinoidea*)—এদের সর্বাঙ্গে শজারুর মতো কাঁটা থাকে এবং গঠন গোলাকার। উদাহরণ ঃ **সি-অরচিন** (*Sea-urchin*)।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ হলোথুরয়ডিয়া (*Holothuroidea*)—এদের দেহ শশার মতো মোটা ও লম্বা। মুখছিদ্র চক্রাকার কর্ষিকা দ্বারা আবৃত। উদাহরণ ঃ **সামুদ্রিক শশা** (*Sea-cucumber*)।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ ক্রাইনয়ডিয়া (*Crinoidea*)—এদের আকার কিছুটা গাছের মতো। এদের দেহ একটি দণ্ডের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে মাটির সঙ্গে আটকে থাকে। উদাহরণঃ **সাগর-শালুক** (*Sea-lilies*), **অ্যান্টিডন**।

মেরুদণ্ডী মেটাজোয়ার মধ্যে একটিমাত্র পর্বের মধ্যে সমস্ত প্রাণী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হ'ল ঃ

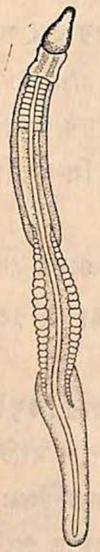
চতুর্দশ পর্ব ঃ কর্ডাটা (*Phylum Chordata*)—এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত আদি প্রাণীগুলির দেহের ভেতর মেরুদণ্ড থাকে না। তার পরিবর্তে নোটোকর্ড নামে সরু নরম হাড় থাকে। এদের **আদি-কর্ডাটা** (*Proto-chordata*) বলা হয়। এদের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় নলের মতো স্নায়ু-রজ্জু থাকে। গল্‌বিলে এদের জোড়া ছিদ্র বা থলি থাকে। কর্ডাটা পর্বের ছুটি ভাগ—

প্রথম ভাগ ঃ অ্যাক্রেনিয়া (*Acrania* : without brain case)—এদের মস্তিষ্কের আবরণ বা হাড়ের খোলস বা করোটি নেই, তাই এদের অ্যাক্রেনিয়া বলা হয়। অ্যাক্রেনিয়া বিভক্তির মধ্যে আদি-কর্ডাটা প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই অ্যাক্রেনিয়ার তিনটি উপপর্ব (sub-phylum)—

প্রথম উপপর্ব ঃ হেমিকর্ডাটা (*Hemichordata* : Gr. : Hemi = half ; chorde = cord)—এই উপপর্বের প্রাণীদের গঠন কেঁচোর

মতো, কিন্তু লম্বায় এরা ছোট। উদাহরণঃ ব্যালানোগ্লসাস্ (*Balanoglossus*)।

দ্বিতীয় উপপর্বঃ ইউরোকর্ডাটা (*Urochordata*) বা টিউনিকেটা—এদের লার্ভা অবস্থায় দেহের ভেতরে নোটোকর্ড দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় নোটোকর্ডের কোন চিহ্ন থাকে না। উদাহরণঃ অ্যাসিডিয়া (*Ascidia*), সালপা, ডোলিওলাম।



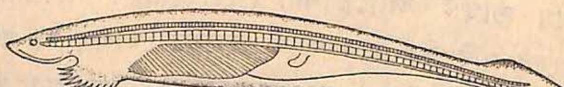
ব্যালানোগ্লসাস্

১৫নং চিত্র—হেমিকর্ডাটার ব্যালানোগ্লসাস্

তৃতীয় উপপর্বঃ সেফালোকর্ডাটা (*Cephalochordata*)—এদের দেহ ছোট মাছের মতো। এরা সমুদ্রের ধারে বালির মধ্যে গর্ত ক'রে বাস করে। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এদের দেহে নোটোকর্ড থাকে। উদাহরণঃ অ্যাম্ফিঅক্সাস্ (*Amphioxus*)।

দ্বিতীয় ভাগঃ ক্রেনিয়াটা (Craniata)—এদের মস্তিষ্কের চার-পাশে হাড়ের আবরণ বা করোটি থাকে। এর দুটি উপপর্ব।

চতুর্থ উপপর্বঃ অ্যাগ্‌নাথা (*Agnatha*)—এই উপপর্বের প্রাণীদের দেহের গঠন মাছের মতো। এদের জোড়া পাখনা থাকে না। মুখছিদ্র চোয়ালে আবদ্ধ নয়। উদাহরণঃ ল্যামপ্রে (*Lamprey*), পেট্রোমাইজন (*Petromyzon*), হ্যাগফিশ (*Hagfish*) এবং মিক্সিন (*Myxine*)।



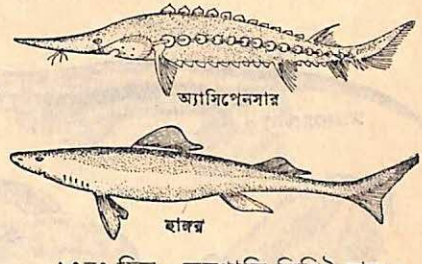
অ্যাম্ফিঅক্সাস্

১৬নং চিত্র—সেফালোকর্ডাটার অ্যাম্ফিঅক্সাস্।

পঞ্চম উপপর্বঃ গ্ন্যাথোস্টোমাটা (*Gnathostomata*)—এই উপপর্বের প্রাণীদের মুখছিদ্র হাড়ের তৈরী চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

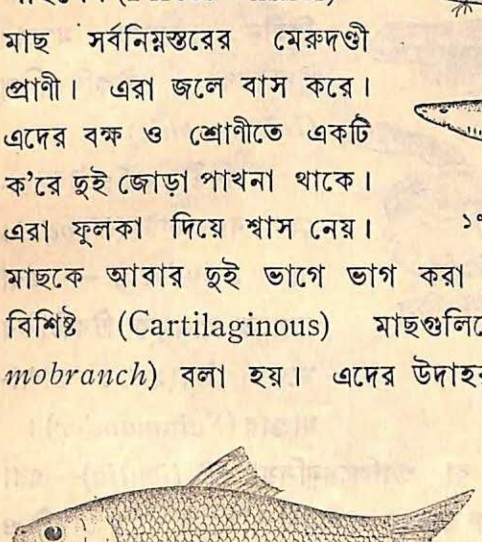
এদের দেহে তুটি জোড়া উপাঙ্গ থাকে। এই উপপর্বের আবার পাঁচটি শ্রেণী—

প্রথম শ্রেণী: মৎস্য বা পাইসেস (Pisces = fishes)—মাছ সর্বনিম্নস্তরের মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা জলে বাস করে। এদের বক্ষ ও শ্রোণীতে একটি ক'রে তুই জোড়া পাখনা থাকে। এরা ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়।



১৭নং চিত্র—তরুণাস্থি-বিশিষ্ট মাছ।

মাছকে আবার তুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নরম বা তরুণাস্থি-বিশিষ্ট (Cartilaginous) মাছগুলিকে ইলাসমোব্রাঙ্ক (*Elasmobranch*) বলা হয়। এদের উদাহরণ: হাঙর (*Shark*), শঙ্কর-মাছ (*Rays*)। যে-সব মাছ অস্থিবিশিষ্ট (bony), তাদের 'Teleostei' বলা হয়। রুই, কাতলা, ইলিশ, শিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদি মাছগুলি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর।

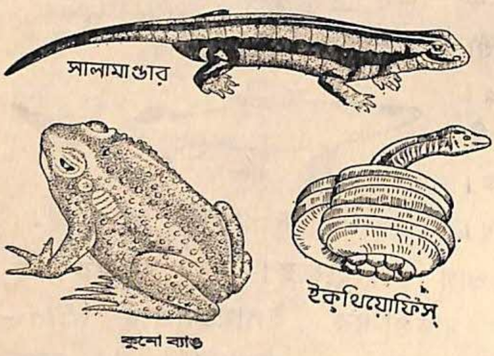


১৮নং চিত্র—তরুণাস্থি ও অস্থি-বিশিষ্ট মাছ।

দ্বিতীয় শ্রেণী: উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া (*Amphibia*)—এদের জীবনধারণের জন্য জল ও স্থল তুই-ই দরকার। এদের জন্ম জলে এবং শৈশবকালও কাটে জলে। পরে এরা জল ত্যাগ ক'রে স্থলে জীবন-যাপন করে। এদের পেছনের পা

লম্বায় বড় ও সামনের পা ছোট হয়। উভচরকে তিনটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম বর্গ ঃ অ্যাপোডা (*Apoda*) বা জিমনোফিয়োনা (*Gymnophiona*)—এরা দেখতে পা-বিহীন কেঁচোর মতো। উদাহরণ ঃ ইকথিওফিস্ (*Ichthyophis*)।



১৯নং চিত্র—উভচর প্রাণী।

দ্বিতীয় বর্গ ঃ ইউরোডেলা বা কডাটা (*Urodela* or *Caudata*) — এরা দেখতে লেজযুক্ত টিকটিকির মতো। উদাহরণ ঃ স্যালামাণ্ডার (*Salamander*)।

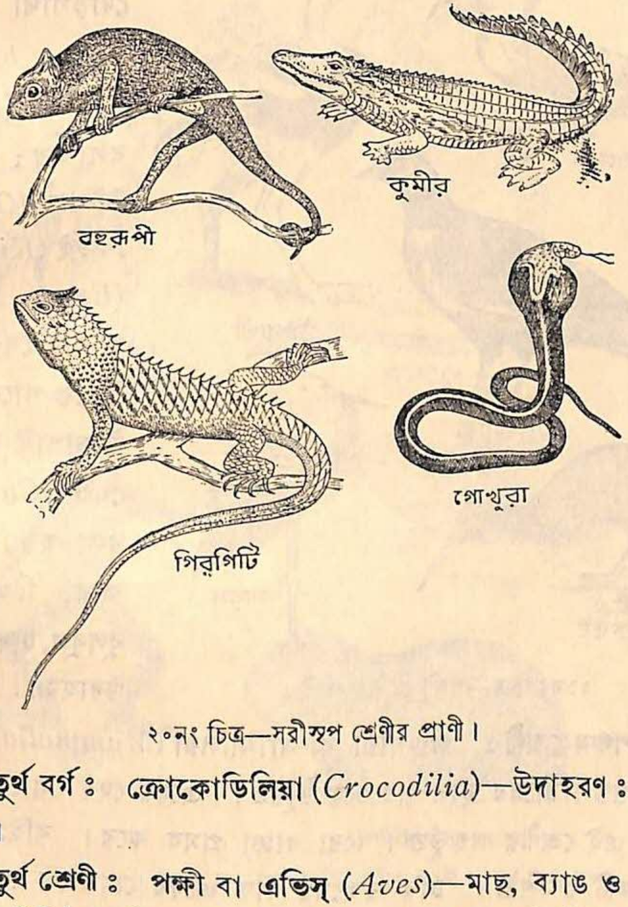
তৃতীয় বর্গ ঃ অ্যানুরা বা স্যালিয়েনসিয়া (*Salientia*)—এরা লেজহীন, চতুষ্পদ, গায়ে গুটিযুক্ত উভচর প্রাণী। সামনের পায়ে চারটি ও পেছনের পায়ে পাঁচটি আঙুল থাকে। চোখ বের করা ও বড়। এরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। উদাহরণ ঃ কুনো-ব্যাঙ (*Toad*), সোনা-ব্যাঙ (*Frog*) ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ সরীসৃপ (*Reptilia*)—বিবর্তনের ধারা অনুসারে উভচর প্রাণীদের পরে সরীসৃপের স্থান। এরা বুকে ভর দিয়ে চলা-ফেরা করে। এদের দেহ শুষ্ক এবং কঠিন আঁশ বা বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত। সামনের ও পেছনের পায়ে পাঁচটি ক'রে নখযুক্ত আঙুল থাকে। এরা জলে ও স্থলে উভয়ক্ষেত্রে বাস করে। সরীসৃপ শ্রেণীকে চারটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম বর্গ ঃ কিলোনিয়া (*Chelonia*)—উদাহরণ ঃ কচ্ছপ (*Turtle* or *Tortoise*)।

দ্বিতীয় বর্গ ঃ রিন্‌কোসেফালিয়া (*Rhinchocephalia*)—উদাহরণ ঃ আদিম প্রাণী স্ফেনোডন।

তৃতীয় বর্গঃ স্কোয়ামাটা (*Squamata*)—উদাহরণঃ সাপ, টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, গো-সাপ ইত্যাদি।

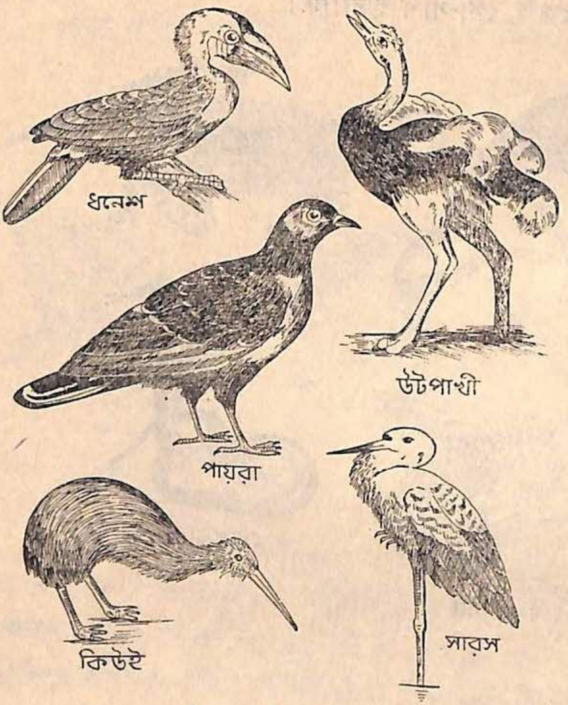


২০নং চিত্র—সরীসৃপ শ্রেণীর প্রাণী।

চতুর্থ বর্গঃ ক্রোকোডিলিয়া (*Crocodilia*)—উদাহরণঃ কুমির, ঘড়িয়াল।

চতুর্থ শ্রেণীঃ পক্ষী বা এভিস্ (*Aves*)—মাছ, ব্যাঙ ও সরীসৃপ শীতল-রক্তবিশিষ্ট প্রাণী (Cold-blooded animal), অর্থাৎ ঠাণ্ডায় এদের দেহের উত্তাপ কমে যায়, আবার গরমে এদের দেহের উত্তাপ বেড়ে যায়। পাখীদের দেহের উত্তাপ সব ঋতুতে সমান, তাই এদের উষ্ণ-রক্ত-বিশিষ্ট (Warm-blooded animal) বলা হয়। জলে, আকাশে ও বাতাসে সর্বত্রই পাখীরা বিচরণ করে। এদের সর্বাঙ্গ পালক দিয়ে আবৃত ও ছুটি পাখনা বা ডানা থাকে। এদের বড়-পালক-বিশিষ্ট একটি লেজ থাকে। ঠোঁট পাখীদের একটি বিশেষত্ব, তেমনি এদের পায়ের আঙুল-

গুলিও নানাভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পায়ে আঁশ থাকে। যে-সব পাখী উড়তে পারে না, তাদের দৌড়পাখী (*Running bird*) বা র্যাটিটি (*Ratitae*) বলা হয়; যেমন—উটপাখী (*Ostrich*), কিউই (*Kiwi*), এমু (*Emu*) ইত্যাদি। আবার যে-সব পাখী উড়তে পারে, তাদের উড়োপাখী বা ক্যারিনেটি (*Carinatae*) বলা হয়। পায়রা, কাক, চিল, শকুন, বুলবুল, চন্দনা এদের উদাহরণ।

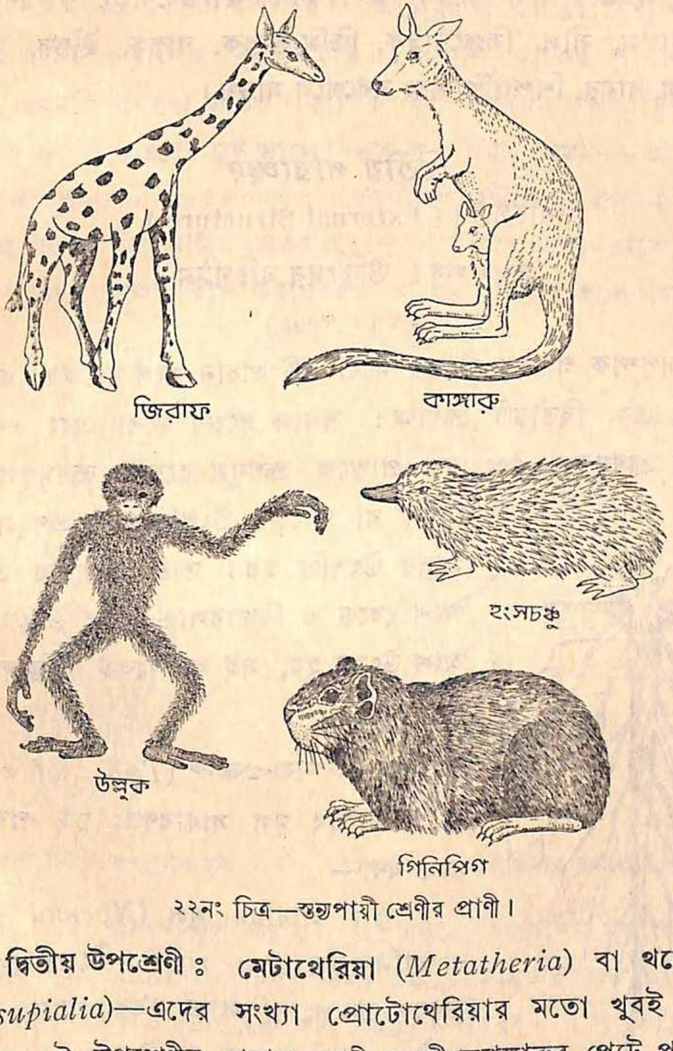


২১নং চিত্র—পক্ষী শ্রেণীর প্রাণী।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ স্তন্যপায়ী বা ম্যামালিয়া (*Mammalia*)—প্রাণিজগতে স্তন্যপায়ীদের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে। এদের দেহ লোমে আবৃত। মানুষও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এরা বাচ্চা প্রসব করে। বহিঃকর্ণ এদের আর একটি বৈশিষ্ট্য। চার রকমের দাঁত এদের চোয়ালে দেখা যায়। গঠন অনুযায়ী এদের দাঁত আবার দুই রকমের; যেমন—দুধে-দাঁত ও স্থায়ী দাঁত। চোখের পাতা, ভ্রূ ইত্যাদি এদের বৈশিষ্ট্য। স্ত্রী-স্তন্যপায়ী জীব নিজ স্তন্যগ্রন্থি দিয়ে নবজাতকদের স্তন্যদুগ্ধ পান করায়। এরা উষ্ণরক্তবিশিষ্ট প্রাণী। ম্যামালিয়াকে তিনটি প্রধান উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

প্রথম উপশ্রেণী ঃ প্রোটোথেরিয়া (*Prototheria*)—আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে এই উপশ্রেণী। এদের দেহের অন্তর্গঠন ও বহির্গঠনে স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ দুই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

উদাহরণ ঃ হংস-চঞ্চু (*Duck-bill-mole*) বা মনোট্রিম (*Monotreme*), পিঁপড়াভুক্ (*Spiny ant-eater*) বা একিডনা (*Echidna*)।



২২নং চিত্র—স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী।

দ্বিতীয় উপশ্রেণী ঃ মেটাথেরিয়া (*Metatheria*) **বা থলে-ধারী** (*Marsupialia*)—এদের সংখ্যা প্রোটোথেরিয়ার মতো খুবই কম। ক্যাঙ্গারু এই উপশ্রেণীর প্রধান প্রাণী। স্ত্রী-ক্যাঙ্গারুর পেটে পকেটের মতো একটি থলি থাকে। এর মধ্যে অপুষ্ট বাচ্চা জন্মায় ও থলির ভেতর বড় হয়। থলিটিকে **মারসুপিয়ম** (*Marsupium*) বলে। উদাহরণ ঃ ক্যাঙ্গারু (*Kangaroo*), ওপোসাম (*Opossum*) ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণীঃ ইউথেরিয়া (*Eutheria*)—এই উপশ্রেণীর প্রাণীগুলি ম্যামালিয়ার সব রকমের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এরা পৃথিবীর সর্বত্র ও সর্বস্তরে বাস করে। উদাহরণঃ হাতি-ঘোড়া, কুকুর-বিড়াল, গোরু-ছাগল, সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি-শুশুক, বাদুড়, ইঁদুর, ছুঁচো, গিনিপিগ, বানর, শিম্পাঞ্জি এবং সর্বশেষে মানুষ।

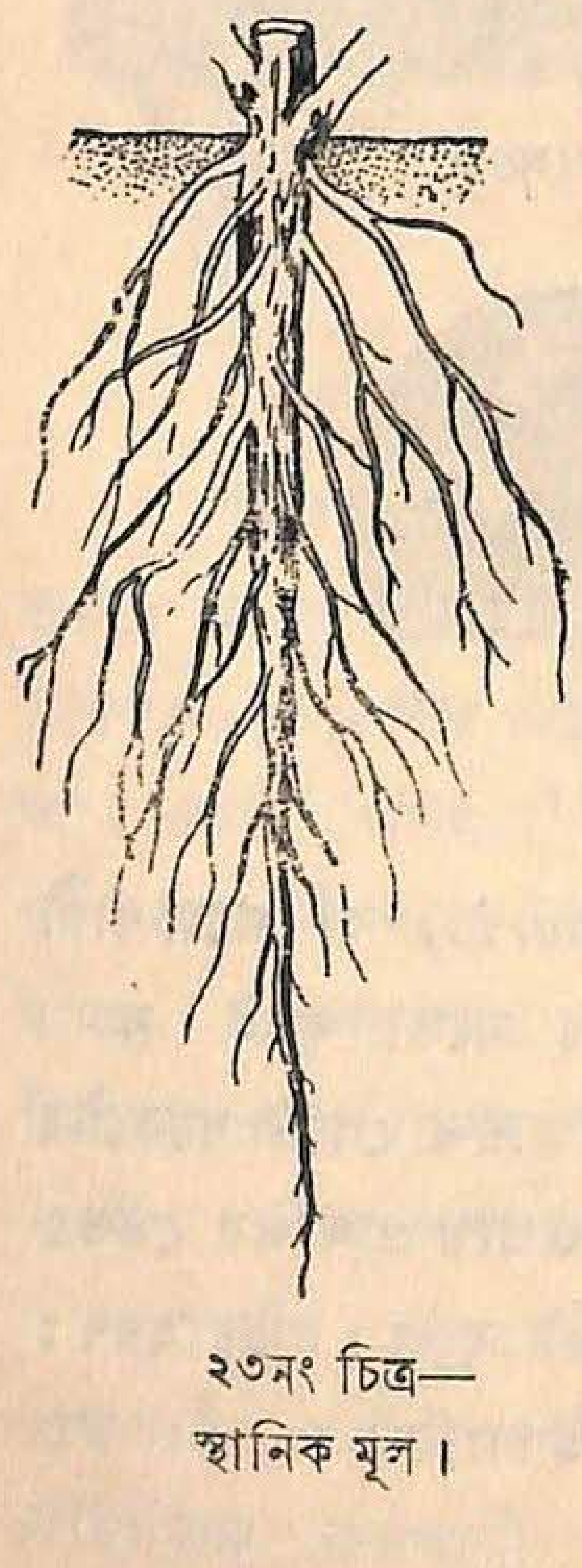
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বহির্গঠন (External Structure)

প্রথম পর্বঃ উদ্ভিদের বহির্গঠন

মূল (*Root*)

সপুষ্পক গাছের বীজের মধ্যে দুটি প্রধান অংশ থাকে। প্রথমটি বীজপত্র এবং দ্বিতীয়টি **ভ্রূণাক্ষ**। ভ্রূণাক্ষ দণ্ডের মতো এবং এর এক প্রান্তকে **ভ্রূণমুকুল** এবং অন্য প্রান্তকে **ভ্রূণমূল** বলে। ভ্রূণমুকুল হতে বিটপ বা কাণ্ডের উৎপত্তি এবং ভ্রূণমূল হতে মূলের উৎপত্তি হয়। তাই ভ্রূণাক্ষের ভ্রূণমূল অংশ বেড়ে ও বিস্তারলাভ ক'রে উদ্ভিদের যে অংশ উৎপন্ন হয়, সেই অঞ্চলকেই উদ্ভিদের মূল বলা হয়।



২৩নং চিত্র—স্থানিক মূল।

মূলের প্রকার-ভেদ (*Types of roots*)

গাছের মূল সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়; যথা—

১। **সাধারণ মূল** (*Normal root*) বা **স্থানিক মূল** (*True root*)ঃ বীজের ভ্রূণাক্ষের ভ্রূণমূল ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ ক'রে প্রথমে সোজা মাটিতে প্রবেশ করে। এই লম্বা গোলাকার দণ্ডের মতো মূলকে **প্রধান মূল** (*Tap root*) বলে। আদিমূলের বৃদ্ধি ও উৎপত্তি প্রণালীকে **স্থানিক মূল** (*True root-system*) বলে।

২। **অস্থানিক মূল** (*Adventitious root*)ঃ ভ্রূণমূল ছাড়া উদ্ভিদের যে-কোন অংশ হতে যে মূল উৎপন্ন হয়, তাকে **অস্থানিক মূল** (*Adventitious root*) বলা হয়। সাধারণতঃ কাণ্ডের নিম্নাংশ বা পর্ব অঞ্চল থেকে অস্থানিক মূল জন্মায়। আবার কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা, পাতা, এমনকি পর্বমধ্য হতেও অস্থানিক মূল জন্মায়। অস্থানিক মূলের উৎপত্তি অনুসারে এদের দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ; যেমন—(ক) **গুচ্ছমূল** বা **শিফামূল** (*Fibrous root*) ঃ একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল হতে ভ্রূণমূল উৎপন্ন হয়ে মাটির ভেতর প্রবেশ ক'রে পরে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তখন মূলের কাজ করার জন্য কাণ্ডের নিম্নাংশ হতে সরু পাতলা



২৪নং চিত্র—অস্থানিক মূল।



২৫নং চিত্র—বিগোনিয়ার পত্রাশ্রয়ী মূল।

সুতোর মতো অসংখ্য মূল জন্মায়। এই ধরনের অস্থানিক মূলকে **গুচ্ছমূল** বা **শিফামুল** (fibrous root) বলা হয়। সাধারণতঃ পেঁয়াজ, রসুন, রজনীগন্ধা প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল এর উদাহরণ। (খ) **পত্রাশ্রয়ী মুল** (*Foliar root*)ঃ কতকগুলি গাছের পাতার প্রান্ত হতে বা পাতার ফলক হতে অস্থানিক মূল জন্মায়। পাথরকুচি গাছের পাতার প্রান্ত হতে অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এই ধরনের অস্থানিক মূলকে পত্রাশ্রয়ী মূল বলা হয়।

মূলের বিভিন্ন অঞ্চল ও তার কার্য

(Parts of a typical root and their functions)

সাধারণতঃ ভ্রূণমূল হতে মূল উৎপন্ন হয় ও মাটির ভেতর থাকে। মূল বর্ণহীন এবং কাণ্ডের মতো পর্ব ও পর্বমধ্যরূপে বিভক্ত হয় না। মূল সাধারণতঃ চারটি অঞ্চলে বিভক্ত ঃ

১। **মূলত্র অঞ্চল** (*Root-cap region*)ঃ মূলের আগায় একটি টুপির মতো ঢাকনা থাকে। একে **মূলত্র** (*root-cap*) বলে। বটগাছের ঝুরির আগায়, কেতকী বা কেয়াগাছের মূলে মূলত্র বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। মূলত্র মূলের মূলাগ্রকে মাটির সঙ্গে ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে। কেয়াগাছে মূলত্র স্তরে স্তরে মূলের আগায় জন্মায়। এই ধরনের মূলত্রকে **বহুযোজা** (*multiple*) মূলত্র বলে।



২৬নং চিত্র—বহুযোজী ও সরল মূলত্র।

২। **বর্ধনশীল অঞ্চল** (*Region of active growth and elongation*)ঃ মূলত্র অঞ্চলের পেছনের অঞ্চলকে মূলের বর্ধনশীল অঞ্চল বলা হয়। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত অঞ্চল। এই অঞ্চলের কোষগুলি দ্রুত ভাগ হয় এবং বৃদ্ধিলাভ করে।



২৭নং চিত্র—মূলের বিভিন্ন অঞ্চল।
(১) মূলত্র অঞ্চল ;
(২) বর্ধনশীল অঞ্চল ;
(৩) মূলরোম অঞ্চল।

৩। **মূলরোম অঞ্চল** (*Root-hair region*)ঃ এই অঞ্চল বর্ধনশীল অঞ্চলের পশ্চাতে বর্তমান। বহু সূক্ষ্ম সুতোর মতো এককোষ-বিশিষ্ট মূলরোম এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের চারদিক হতে জন্মায়। মূলরোমগুলি মাটির ভেতরে বিস্তারলাভ করে এবং মাটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। মাটির ভেতরকার

জলমিশ্রিত অজৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে মূলরোম অভিস্রবণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষণ করে।

৪। **স্থায়ী অঞ্চল** (*Permanent region*) ঃ মূলরোমের পেছনের শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট অঞ্চলই মূলের স্থায়ী অঞ্চল। শাখা-প্রশাখাগুলি উদ্ভিদ্‌কে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ক'রে রাখে ও মূলরোমের দ্বারা শোষিত, জল-মিশ্রিত, অজৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে প্রধান মূলের দিকে পাঠায়। প্রধান মূল আবার এই রস-পদার্থকে কাণ্ডের ভিতর চালনা করে।

পরিবর্তিত মূল (Modified roots)

মূলের সাধারণ কাজ ব্যতীত বিশেষ উদ্ভিদ্ তার মূল পরিবর্তন ক'রে বিশেষ কাজগুলি করে। তখন মূলের সাধারণ আকারেরও পরিবর্তন হয়। প্রধান মূল ও অস্থানিক মূলগুলির বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন দেওয়া হ'ল ঃ

(ক) **প্রধান মূলের পরিবর্তন** (*Modification of tap-root*) ঃ কোন কোন উদ্ভিদের প্রধান মূলে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এর ফলে মূলগুলি স্ফীত হয় ও তার আকারে পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণতঃ তিন রকমের প্রধান মূলের পরিবর্তন দেখা যায়—

(১) **মূলাকৃতি বা মোচাকৃতি** (*Fusiform*) ঃ যখন প্রধান মূলের মধ্যভাগ সর্বাপেক্ষা স্ফীত হয় এবং অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত সরু ও পশ্চাদ্ভাগ আরও সরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। উদাহরণ ঃ **মূলার মূল**।



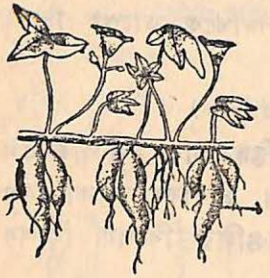
২৮নং চিত্র—খাদ্য-সঞ্চয়ের জন্য মূলের বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তিত আকার।

(২) **শাঙ্কব** (*Conical*) ঃ যখন প্রধান মূলের অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত স্ফীত এবং ধীরে ধীরে লম্বাকারে সরু হতে-হতে শেষ হয়ে যায়। এই ধরনের প্রধান মূল—**গাজর**।

(৩) **শালগমাকার** (*Napiform*) ঃ যখন প্রধান মূলের অগ্রভাগ গোলাকৃতি হয়ে, পরে হঠাৎ সরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। এই ধরনের প্রধান মূল—**বীট ও শালগম**।

(খ) **অস্থানিক মূলের পরিবর্তন** (*Modification of adventitious roots*)ঃ প্রধান মূলের মতো অস্থানিক মূলও খাদ্য-সঞ্চয়ে স্ফীত হয়ে নানারকমের আকার ধারণ করে। এই ধরনের মূলের প্রধান প্রধান আকৃতিগুলি নিচে দেওয়া হ'ল ; যথা—

১। **কন্দমূল** বা কন্দালমূল (*Tuberous root*)ঃ যখন অস্থানিক মূলের প্রতিটি শাখা কন্দের মতো লম্বা, আকৃতি-বিহীন ও স্ফীত হয়, তখন একে কন্দালমূল বলে। উদাহরণঃ রাঙা-আলু।



২৯নং চিত্র—রাঙা-আলুর কন্দালমূল।



৩০নং চিত্র—শতমূলীর গুচ্ছিত মূল।

২। **গুচ্ছিত মূল** (*Fasciculated root* : Fascicle = bundle)ঃ যখন কাণ্ডের তলদেশ হতে গুচ্ছের মতো বহু অস্থানিক মূল বের হয় এবং গুচ্ছের প্রত্যেকটি অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চিত ক'রে লম্বাকারে স্ফীত হয়, তখন এই রকমের অস্থানিক মূলকে 'গুচ্ছিত মূল' বলা হয়। উদাহরণঃ **শতমূলীর গুচ্ছিত মূল।**

৩। **গুটিকাযুক্ত মূল** বা **অর্বুদযুক্ত মূল** (*Nodulose*)ঃ যখন সরু সরু অস্থানিক মূলগুলির শেষাগ্র গোলাকারে স্ফীত হয়ে শেষ হয়, তখন এই রকমের মূলগুলিকে গুটিকা-যুক্ত মূল বলা হয়। **মুথা-ঘাস** এর উদাহরণ।



৩১নং চিত্র—আম-আদার অর্বুদযুক্ত মূলঃ



৩২নং চিত্র—কাঁকরোলের মালাকৃতি মূল।

৪। **মালাকার বা মালাকৃতি** (*Moniliform*) : যখন অস্থানিক মূলগুলি তুলসীর মালার মতো বা মটর-হারের মতো যথাক্রমে স্ফীত ও সঙ্কুচিতভাবে থাকে, তখন এইরূপ মূলকে মালাকার বা মালাকৃতি মূল বলে। ইপিকাক-এর মূলগুলি এর উদাহরণ।

৫। **স্তম্ভমূল** বা ঝুরি (*Prop root.* Prop=pillar) : এই রকমের মূল বটগাছের স্থূল শাখা হতে খাড়াভাবে মাটিতে প্রবেশ করে; পরে এটি স্ফীত হয়ে মোটা থামের মতো আকার ধারণ করে। এইভাবে অস্থানিক মূলগুলি গাছের শাখা-প্রশাখার ভার বহন করে। এই ধরনের মূলকে স্তম্ভমূল বলে।



৩৩নং চিত্র—বটগাছের স্তম্ভমূল।

৬। **ঠেসমূল** (*Stilt root*) : কেতকী বা কেয়া গাছের কাণ্ড হতে বহু অস্থানিক মূল বের হয়ে তির্যক্‌ভাবে মাটির ভেতর প্রবেশ করে। এইভাবে কাণ্ডের চারপাশ হতে অস্থানিক মূল বেরিয়ে গাছটিকে ঠেস দিয়ে



৩৪নং চিত্র—কেয়া গাছের ঠেসমূল।



৩৫নং চিত্র—পান গাছের আরোহী মূল।

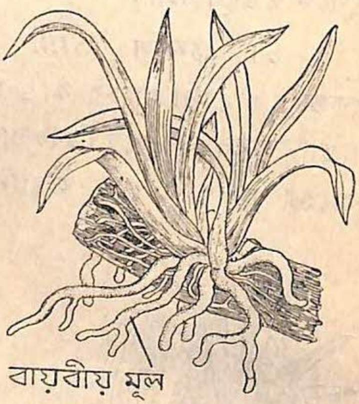
সোজাভাবে দাঁড়াতে সাহায্য করে। এই ধরনের মূলকে ঠেসমূল বলে।

৭। **আরোহী মূল** (*Climbing root*) : **পান** বা **গাছ-পিপুল** প্রভৃতি লতানে উদ্ভিদের পর্ব ও পর্বমধ্য হতে অস্থানিক মূল বের হয়ে যে-কোন অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে এবং সেই অবলম্বনকে আশ্রয় ক'রেই সূর্যালোকের জন্য উপরে উঠতে থাকে। এই ধরনের অস্থানিক মূলকে আরোহী মূল বলে।

৮। **শ্বাসমূল** (*Pneumatophore* or *breathing root*) : সুন্দরবনের মাটি নোনা, জলও নোনা। এই ধরনের মাটিতে অক্সিজেন খুব কম পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশে থাকে। তাই এই রকমের জায়গায় উদ্ভিদ্‌গুলি, যথা—**সুঁদরী, কেওড়া, গেঁও** বা **গরান** প্রভৃতির



৩৬নং চিত্র—সুঁদরী গাছের শ্বাসমূল।



৩৭নং চিত্র—অর্কিড বা রাস্নার পরাশ্রয়ী মূল।

অস্থানিক মূলগুলি সবসময় অক্সিজেন-বর্জিত লবণাক্ত মাটির ভেতর থাকে। এতে মূলগুলি শ্বাসকার্যের জন্য অক্সিজেন পায় না। তাই এদের মধ্যে কতকগুলি মূল খাড়াভাবে মাটি ভেদ ক'রে উপরের দিকে সোজা ওঠে। এই ধরনের মূলের অগ্রভাগে প্রচুর ছিদ্র থাকে। ছিদ্রের দ্বারা মূল শ্বাসকার্য নির্বাহ করে। তাই এদের শ্বাসমূল বলে।

৯। **পরাশ্রয়ী মূল** (*Epiphytic*) : রাস্না প্রভৃতি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের

কতকগুলি অস্থানিক মূল অবলম্বনকে আঁকড়ে থাকে এবং বাকী অস্থানিক মূলগুলি বাতাসে ঝুলতে থাকে। এই ধরনের বায়বীয় মূলগুলি বেশ লম্বা। প্রতিটি মূলকে বেষ্টন ক'রে থাকে **ভেলামেন** (*Velamen*) কোষস্তর। কোষগুলি বাতাস থেকে সোজাসুজি জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে।

১০। **আত্তীকরণ মূল** (*Assimilatory root*) ঃ **গুলঞ্চ** (*Tinospora*) প্রভৃতি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের সরু ও পাতলা অস্থানিক মূলগুলি সূর্যের আলোর শক্তি হতে নিজেদের দেহের ভেতর ক্লোরোফিল বা সবুজকণা তৈরি করতে পারে।

১১। **শোষণ-মূল** বা **চোষক মূল** (*Haustoria* or *Parasitic root*) ঃ স্বর্ণলতা, আলোকলতা বা বান্ডা প্রভৃতি পরজীবী উদ্ভিদ্গুলি সাধারণতঃ সবুজকণা-বিহীন। সেইজন্য এরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে না। তাই খাদ্যগ্রহণের জন্য এরা কাণ্ড থেকে সরু সরু পাতলা অসংখ্য অস্থানিক মূল উৎপন্ন করে। এই মূলগুলি আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কাণ্ডের ভেতর প্রবেশ ক'রে কাণ্ডের ভেতর থেকে খাদ্যরস শোষণ ক'রে নেয়। এই ধরনের অস্থানিক মূলগুলিকে **শোষণ-মূল** বা **চোষক মূল** বলে। আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্গুলি ধীরে ধীরে রসহীন হয়ে শুকিয়ে মরে যায় ও পরজীবী উদ্ভিদ্ শোষিত রসে নিজের দেহটিকে পুষ্ট করে।

১২। **জলজ শ্বাসমূল** (*Aquatic breathing root*) ঃ **কেসরা** প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের ভাসমান কাণ্ডের শাখা হতে বহু অস্থানিক মূল জন্মায়। মূলগুলি বর্ণহীন, হালকা ও স্পঞ্জের মতো। এরা জলের উপর ভেলার মতো ভাসতে থাকে। মূলগুলি শ্বাসকার্য করে।



৩৮নং চিত্র—স্বর্ণলতার শোষণ-মূল।



৩৯নং চিত্র—কেসরা গাছের জলজ শ্বাসমূল।

উদ্ভিদের কাণ্ড ও প্রকারভেদ
(Types of Stems)

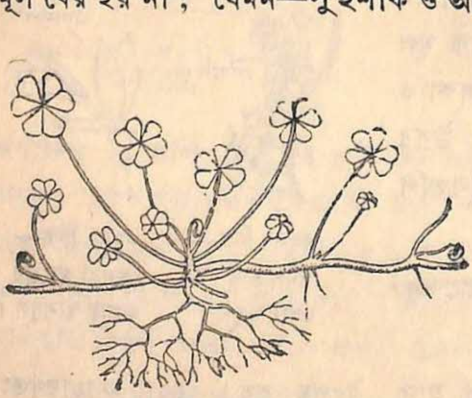
কাণ্ড সর্বদাই ভ্রূণমুকুল হতে উৎপন্ন হয়। এরা সাধারণতঃ মাটির উপর থাকে এবং আলোকমুখী হয়। কাণ্ড সর্ব্বদা পর্ব (*Node*) ও

পর্বমধ্য (*Internode*) এই দুই ভাগে দেখা যায় এবং মুকুল, পাতা ও ফুল পর্যায়ক্রমে কাণ্ড হতে উৎপন্ন হয়। কাণ্ড নানা প্রকারের, সেইজন্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ একে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করেছেন ; যথা—

(১) **সবল কাণ্ড** (*Strong* or *Woody stem*)ঃ যে-সব কাণ্ড সমস্ত উদ্ভিদের ভার বহন করতে পারে ও সোজা হয়ে তাকে মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করতে পারে—এই ধরনের কাণ্ডকে সবল কাণ্ড বলে। সবল কাণ্ডের অন্তর্গঠনের মধ্যে কিছু কাঠ থাকে। উদাহরণঃ আম, জাম, পাইন, কাঁঠাল, বট ইত্যাদি।

(২) **দুর্বল কাণ্ড** (*Weak stem*)ঃ যে-সকল কাণ্ড মাটির উপর উদ্ভিদের সমস্ত ভার বহন করতে পারে না বা দুর্বল কাণ্ডের জন্য উদ্ভিদ্ মাটির উপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—তাদের দুর্বল কাণ্ড বলে। দুর্বল-কাণ্ড-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ অন্য উদ্ভিদ্ বা আশ্রয়ের সঙ্গে জড়িয়ে বা মাটির ত্বক্‌কে স্পর্শ ক'রে বাড়তে থাকে। উদাহরণঃ দূর্বাঘাস, পুঁইশাক, পান, মাধবীলতা ইত্যাদি। দুর্বল-কাণ্ড উদ্ভিদ্‌কে, তাদের অবস্থান-পদ্ধতি অনুসারে, দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ; যথা—

(ক) **ব্রততী** (*Creepers*)ঃ যে লতানে উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ড মাটির ত্বক্ স্পর্শ ক'রে বা মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে লম্বালম্বিভাবে বাড়তে থাকে, তাদের ব্রততী উদ্ভিদ্ বলা হয়। এদের পর্ব থেকে অস্থানিক মূল বের হয় না ; যেমন—**পুঁইশাক** ও **আমরুল** উদ্ভিদ্।



৪০নং চিত্র—ব্রততী (আমরুল)।

(খ) **রোহিণী** (*Climbers*)ঃ এই ধরনের লতানে উদ্ভিদ্ নানারকমের অঙ্গের দ্বারা অন্য বৃক্ষের বা কোন আশ্রয়ের উপর আরোহণ করে। এই ধরনের উদ্ভিদ্‌কে রোহিণী বলা হয়। যে-সমস্ত অঙ্গের দ্বারা

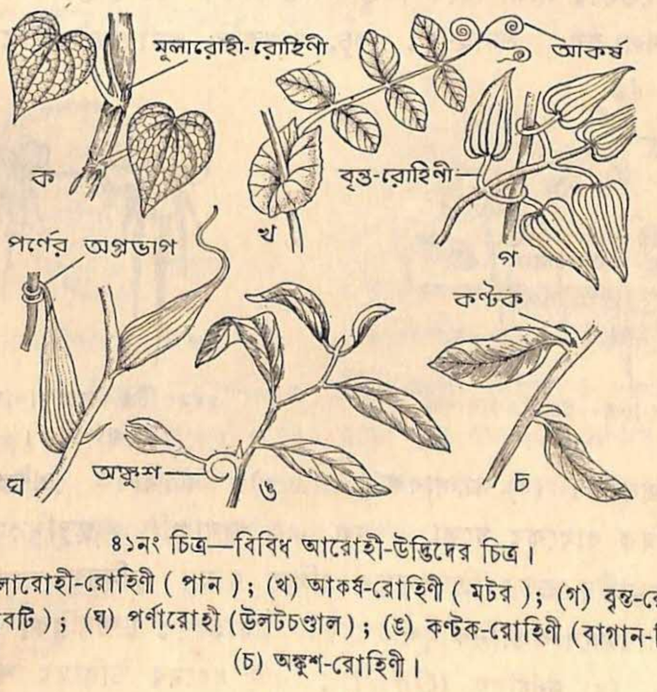
আরোহণপ্রণালী কার্যকরী হয়, সেইসকল অঙ্গের ভিত্তিতেই রোহিণী নিম্নলিখিত প্রকারের হয়; যথা—মূলারোহী-রোহিণী, আকর্ষ-রোহিণী, বৃন্ত-রোহিণী, অঙ্কুশ-রোহিণী, কণ্টক-রোহিণী ও কাষ্ঠল-লতা ইত্যাদি।

পরিবর্তিত কাণ্ড (Modified Stem)

বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য গাছের কাণ্ডের নানারকমের পরিবর্তন হয়। কাণ্ডের অবস্থিতি অনুসারে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; যথা—(ক) অর্ধ-বায়বীয় কাণ্ড; (খ) মৃদ্‌গত বা ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড; (গ) বায়বীয় কাণ্ড।

(ক) অর্ধ-বায়বীয় কাণ্ড (Sub-aerial Stem)

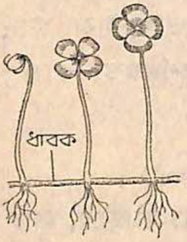
কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির উপর সোজাসুজি না দাঁড়িয়ে, মাটি স্পর্শ ক'রে সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে। কাণ্ডের কিছু শাখা মাটির নিচে কাণ্ডের মুকুল থেকে জন্মায়। এই ধরনের কাণ্ডের পর্বের উপরভাগ থেকে পাতা ও নিচের অংশ থেকে অস্থানিক মুকুল জন্মায়। কাণ্ডের



৪১নং চিত্র—বিবিধ আরোহী-উদ্ভিদের চিত্র।

(ক) মূলারোহী-রোহিণী (পান); (খ) আকর্ষ-রোহিণী (মটর); (গ) বৃন্ত-রোহিণী (হোগলাবটি); (ঘ) পর্ণারোহী (উলটচণ্ডাল); (ঙ) কণ্টক-রোহিণী (বাগান-বিলাস); (চ) অঙ্কুশ-রোহিণী।

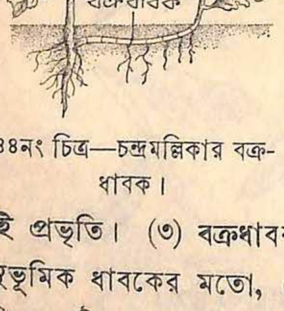
পর্বমধ্য নষ্ট হয়ে গেলে, এক-একটি পর্ব এক-একটি স্বতন্ত্র গাছে পরিণত হয়। এই ধরনের কাণ্ডের জন্য কিছু উদ্ভিদ্ এই ধরনের **অঙ্গজ জননের** (*Vegetative propagation*) দ্বারা বংশ-বিস্তার করে। চারপ্রকার অর্ধ-বায়বীয় কাণ্ড দেখা যায় ; যথা : (১) **ধাবক** (*Runner*)—কতকগুলি গাছ ও তার শাখা মাটি স্পর্শ ক'রে সমান্তরালভাবে ক্রমাগত বাড়তে থাকে। লম্বা পর্বমধ্য দিয়ে উদ্ভিদ্ মাটির উপর এগিয়ে যায়। এইসব উদ্ভিদ্‌কে ধাবক বলে। **উদাহরণ : আমরুল, কলমি, শুশনি** প্রভৃতি শাক-জাতীয় উদ্ভিদ্। (২) **অনুভূমিক ধাবক** (*Stolon*)—এই ধরনের উদ্ভিদের শাখা মাটির নিম্নস্থ কাণ্ড থেকে জন্মায়। শাখাগুলি মাটির ভেতরে নানা দিকে বিস্তারলাভ করে। এই উদ্ভিদ্‌কে **অনুভূমিক ধাবক** বলা হয়। উদাহরণ : **কচু, থানকুনি, অ্যারারুট, ঝুমকোলতা,**



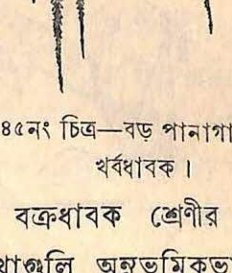
৪২নং চিত্র—শুশনির ধাবক।



৪৩নং চিত্র—কচুর অনুভূমিক ধাবক।



৪৪নং চিত্র—চন্দ্রমল্লিকার বক্র-ধাবক।



৪৫নং চিত্র—বড় পানাগাছের খর্বধাবক।

জুঁই প্রভৃতি। (৩) **বক্রধাবক** (*Sucker*) : বক্রধাবক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ অনুভূমিক ধাবকের মতো, কেবল এর শাখাগুলি অনুভূমিকভাবে না এগিয়ে মাটির ভেতর তির্যক্‌ভাবে এগিয়ে যায়। ভূনিম্নস্থ শাখা থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্থানিক মূল জন্মায়। উদাহরণ : **চন্দ্রমল্লিকা ও পুদিনা** উদ্ভিদ্। (৪) **খর্বধাবক** (*Offset*) : এই ধরনের উদ্ভিদের শাখাগুলি

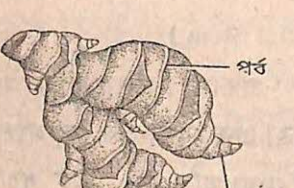
ধাবকের মতো। এর শাখাগুলি খুব ছোট অর্থাৎ পর্বমধ্য খুব ছোট ও মোটা হওয়ায় পর্বের সংখ্যা বেশী হয়। পর্ব থেকে প্রচুর অস্থানিক মূল বের হয়। উদাহরণ : বড় পানা ও কচুরীপানা।

(খ) মৃদ্গত বা ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড

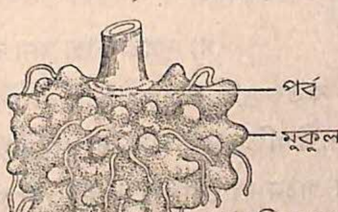
(Underground or Subterranean Stem)

প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কতকগুলি উদ্ভিদ্ মাটির ভেতরেই বৃদ্ধিলাভ করে। তাই এইরকমের উদ্ভিদের কাণ্ডগুলিকে প্রতিকূলজীবিতার (*Perennation*) আদর্শ উদাহরণরূপে গণ্য করা হয়। সাধারণতঃ ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড চার রকমের দেখা যায় ; যথা :

(১) রাইজোম (*Rhizome*) : এইরকমের উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির ভেতর অনুক্রমিকভাবে অবস্থান করে। কাণ্ডগুলি স্থূল এবং এদের দেহে সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য দেখা যায়। পর্বমধ্যগুলি শল্কপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। শল্কপত্রের কক্ষে মুকুল জন্মায়। মুকুল থেকে শাখা-প্রশাখা জন্মায়। এই ধরনের কাণ্ডকে রাইজোম বলা হয়। আদা, হলুদ, ফার্ন, সর্বজয়া বা কলাবতী রাইজোমের উদাহরণ।



৪৬নং চিত্র—আদার রাইজোম।

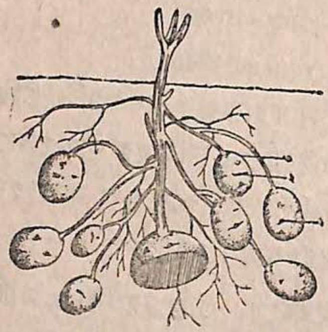


৪৭নং চিত্র—ওলের গুঁড়িকন্দ।

(২) গুঁড়িকন্দ (*Corm*) : এটি একটি প্রসারিত গোলাকার রাইজোম। কাণ্ডটি গাছের গুঁড়ির মতো স্থূল হয় এবং সঞ্চিত খাদ্যে পরিপূর্ণ থাকে। কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে এবং পর্বমধ্য শল্কপত্রে ঢাকা থাকে। ওল গাছের কাণ্ড গুঁড়িকন্দ-জাতীয়।

(৩) স্থূলকন্দ (*Tuber*) : আলু ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড বা শাখা। একে স্থূলকাণ্ড বলে। ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড হতে পাতার অক্ষের কাক্ষিক মুকুল ও

প্রচুর শাখা-প্রশাখা জন্মায়। শাখা-প্রশাখায় অপ্রসারিত পর্ব, পর্বমধ্য এবং শল্কপত্র থাকে। শাখা-প্রশাখার শেষাগ্র ধীরে ধীরে খাদ্য সঞ্চয় ক'রে স্ফীত হতে থাকে এবং পরে গোলাকারে পরিণত হয়।



৪৮নং চিত্র—আলুর স্থূলকন্দ।

৪। কন্দ (*Bulb*)ঃ এটি একরকমের ভূ-নিম্নস্থ ক্ষুদ্রতম



৪৯নং চিত্র—পেঁয়াজের বিবিধ অঞ্চল।

কাণ্ড। কাণ্ডটি দেখতে গোলাকার চাকতির মতো। এর পর্বমধ্যগুলি খুবই সঙ্কুচিত। কাণ্ডের উপরিতলে রসাল শল্কপত্রগুলি এমনভাবে জন্মায় যে, সেগুলি কাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন ক'রে রাখে। পেঁয়াজ ও লিলি কন্দের উদাহরণ।

(গ) বায়বীয় কাণ্ড (Aerial Stem)

কতকগুলি গাছের কাণ্ড ও এদের শাখা-প্রশাখা বিশেষ কাজ করার জন্যে পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা এত বেশী হয় যে, সাধারণ শাখার গঠন বা বৈশিষ্ট্য এদের দেহে কিছুই দেখা যায় না। এই ধরনের পরিবর্তিত শাখাগুলিকে **রূপান্তরিত কাণ্ড** (*Metamorphosed stem*) বলে এবং এই পরিবর্তনের পদ্ধতিকে **রূপান্তর** (*Metamorphosis*) বলা হয়। বায়বীয় কাণ্ড তিন প্রকারের ; যথা—

(১) আকর্ষ (*Stem-tendril*)ঃ এই ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড দেখতে অদ্ভুত। সরু, পাতাহীন তারের মতো এর গঠন। একে আকর্ষ বলে। গাছের বা কাণ্ডের আকর্ষ অবলম্বনের গায়ে জড়িয়ে উদ্ভিদ্‌কে উপরে উঠতে সাহায্য করে। আকর্ষ সাধারণতঃ পত্রকক্ষ থেকে জন্মায়। ঝুমকোলতা গাছের আকর্ষ এর উদাহরণ।

(২) শাখা-কন্টক (*Thorn*) : পত্রকক্ষের মুকুলটি শাখায় পরিণত না হয়ে, একটি বা তুটি সোজা, শক্ত ও সুচালো কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। পত্রকক্ষ থেকে এর উৎপত্তি হওয়ায় কাঁটা একটি রূপান্তরিত শাখা। মেহেদী ও বাগান-বিলাস উদ্ভিদের কাঁটা শাখা-কন্টকের উদাহরণ।



৫০নং চিত্র— ঝুমকোলতার আকর্ষ।

(৩) পর্ণকাণ্ড (*Phylloclade*) : ফণিমনসা উদ্ভিদের কাণ্ড চ্যাপটা ও রসালো। এদের রঙ সবুজ ও অনেকটা পাতার মতো। কাণ্ডের এই ধরনের অদ্ভুত রূপান্তরকে পর্ণকাণ্ড বলে। পর্ণকাণ্ডের উপর ছোট পাতা জন্মায়। আবার কোন কোন উদ্ভিদের পাতাগুলি পত্রকন্টকে (*Spine*) রূপান্তরিত হয়।

এক-পর্বমধ্য-বিশিষ্ট পর্ণকাণ্ডকে ক্ল্যাডোড (*Cladode*) বা এক্ক পর্ণকাণ্ড বলে। শতমূলী উদ্ভিদে ক্ল্যাডোড জন্মে। পর্ণকাণ্ড, পর্ব, পর্বমধ্য ও পত্রকক্ষ হতে কাক্ষিক মুকুল জন্মায়।



৫১নং চিত্র— বেলগাছের শাখা-কণ্টক।


৫২নং চিত্র— ফণিমনসার পর্ণকাণ্ড।

কাণ্ডের সাধারণ কার্য : কাণ্ড সাধারণতঃ তুই রকমের কাজ করে। কাণ্ড হতে শাখা ও প্রশাখা জন্মায়। শাখা-প্রশাখা হতে পাতা ও ফুল জন্মায়। ফুলই উদ্ভিদের প্রজনন-অঙ্গ। ফুল হতে ফলের সৃষ্টি। ফল বীজধারণ করে। বীজ হতেই উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয়। সুতরাং কাণ্ডই পরোক্ষভাবে বংশবিস্তারের কাজ করে এবং বিটপের সমস্ত অঙ্গগুলিকে বহন করে। কাণ্ডের ভেতরকার কলাগুলি জৈবনিক কাজ করে। সবুজ পাতা শর্করা-খাদ্য তৈরি করে।

পাতা (Leaf)

কাণ্ডের অগ্রমুকুল বা পর্বের কাক্ষিক মুকুল প্রস্ফুটিত হয়ে পাতলা, প্রসারিত সবুজ রঙের পাতায় পরিণত হয়। শাখার মতো পাতাও উদ্ভিদের বাইরের অঙ্গ, অর্থাৎ কাণ্ডের বহির্মজ্জা হতেই এদের উৎপত্তি। এ ছাড়াও

কাজ, আকৃতি ও পরিবর্তিত রূপ অনুযায়ী নানাপ্রকারের পাতা উদ্ভিদে দেখা যায় ; যেমন—



৫৩নং চিত্র—শতমূলীর ক্ল্যাডোড।

১। **বীজপত্র** (*Cotyledon*) : সপুষ্পক বীজের মধ্যস্থ ভ্রূণের পাতাকে বীজপত্র বলে। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজপত্র যথাক্রমে এক ও দুটি ক'রে থাকে।

২। **শল্কপত্র** (*Scale-leaf*) : শল্কপত্র এমন একরকমের পাতা, যার বৃন্ত নেই এবং দেখতে বাদামী রঙের পাতলা কাগজের মতো। কিন্তু এটি সাধারণ পাতার মতো কাণ্ডের পর্ব হতে জন্মায়। আদা, আলু, হলুদ প্রভৃতি কাণ্ডে পাতলা পর্দার মতো শল্কপত্র থাকে।

৩। **মঞ্জরীপত্র** (*Bract-leaf*) : গাছের পুষ্পদণ্ড কাণ্ডের পরিবর্তিত রূপ। এর পর্বে ছোট ছোট সরু পাতা জন্মায়। এই পাতাগুলিকে মঞ্জরীপত্র বলে। মঞ্জরীপত্র আকারে ও রঙে নানা রকমের হয়; যেমন—জবা গাছে দেখা যায় সরু, ছোট, সবুজ রঙের।

৪। **পুষ্পপত্র** (*Floral leaf*) : যে-কোন আদর্শ ফুলে চারিটি অংশ থাকে। ফুলের প্রতিটি অংশ সাধারণ পাতার পরিবর্তিত রূপ। ফুলের এই চারটি অংশকে যথাক্রমে **বৃত্যংশ** (*Sepal*), **পাপড়ি** (*Petal*), **পুংকেশর** (*Stamen*) ও **গর্ভপত্র** (*Carpel*) বলা হয়।

৫। **পর্ণরাজি** (*Foliage leaf*) : সাধারণ পাতাকে পর্ণরাজি বা পল্লব বলে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার কাণ্ড হতে মুকুলের মাধ্যমে পাতা জন্মায় এবং দেখতে সবুজ রঙের হয়।

পাতার অংশ (Parts of Leaves) : একটি আদর্শ পাতার সাধারণতঃ তিনটি অংশ থাকে ; যথা : (ক) **পত্রমূল** (*leaf-base*)—পাতার সরু গোলাকার অংশের শেষাগ্রটিকে পত্রমূল বলে। এর দ্বারাই পাতা কাণ্ড বা শাখার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। (খ) **বৃন্ত** (*Petiole*)—এটি সরু, গোলাকার দণ্ডের মতো এবং পাতার বিস্তারিত অংশের ধারক। (গ) **ফলক** (*leaf-blade* or *lamina*)—এটি পাতার পাতলা সবুজ রঙের

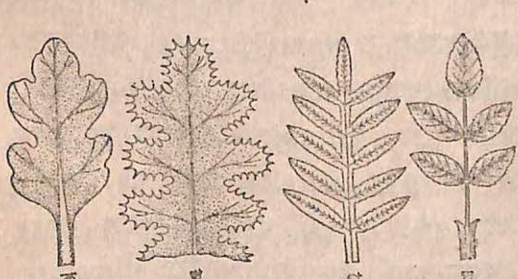
বিস্তারিত অংশ। উপরোক্ত তিনটি অংশের মধ্যে যে-কোন একটি অংশ পাতায় না থাকলে, সে পাতাকে অসম্পূর্ণ পাতা বলে।

পাতার প্রকার-ভেদ (Types of Leaves) : পাতা সাধারণতঃ দুই প্রকারের, যেমন : (ক) **একক পত্র বা সরল পত্র** (*Simple leaf*)—যখন পাতার ফলকটি সম্পূর্ণ থেকে, বৃন্তের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সেই বৃন্তের একটি মাত্র ফলক থাকলে, সেইরকমের পাতাকে একক পত্র বা সরল পত্র বলে ; যথা—আম, জাম, বট, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, শিয়াল-কাঁটা, ঢেঁড়স প্রভৃতি গাছের পাতা।



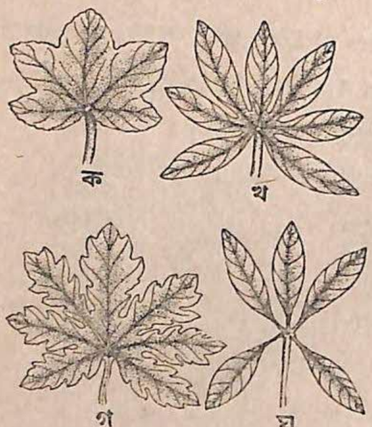
৫৪নং চিত্র—একটি জবা পাতার বিভিন্ন অংশ।

(খ) যৌগপত্র (*Compound leaf*) : যখন পাতার ফলকটি কয়েকটি খণ্ডে এমনভাবে খণ্ডিত হয়, যাতে খণ্ডের প্রান্ত, মধ্যশিরার সঙ্গে অথবা বৃন্তের আগায় এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, তখন সেই-রকমের পাতাকে যৌগপত্র বলে। সাধারণতঃ এককপত্রই খণ্ডিত হয়ে যৌগপত্রে রূপান্তরিত হয়। যৌগপত্রের ছোট ছোট খণ্ডগুলিকে পত্রক (*Leaflet*) বলা হয়। এককপত্র যৌগপত্রে পরিবর্তিত হওয়ার পরে ছোট ছোট পত্রক-বিশিষ্ট এককপত্রের মধ্যশিরা-টিকে পত্রক-কক্ষ (*Rachis*) বলা হয়। পত্রক-কক্ষের সঙ্গে পত্রকগুলি বিপরীত-বিন্যাসে সংযুক্ত হয়ে থাকে। যখন পত্রকগুলি বিপরীত-বিন্যাসে পত্রক-কক্ষের দুই পাশে পাখীর



৫৫নং চিত্র—পক্ষল-জাতীয় এককপত্রের খণ্ডক দেখানো হয়েছে : ক, পক্ষবৎ খণ্ডিত ; খ, পক্ষবৎ উপখণ্ডিত ; গ, পক্ষবৎ অতিখণ্ডিত ; ঘ, পক্ষল যৌগপত্র।

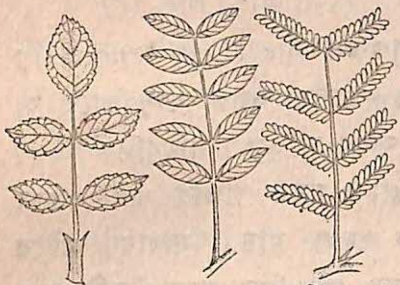
পালকের মতো সাজানো থাকে, তখন সেইরকমের যৌগপত্রকে **পক্ষল-যৌগপত্র** (*Pinnate Compound leaf*) বলা হয়; যথা—গোলাপ, তেঁতুল, অপরাজিতা ইত্যাদি গাছের পাতা। আবার যৌগপত্রের পত্রকগুলি চারদিক হতে এসে যদি বৃন্তের অগ্রভাগের এক-বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে **করতলাকার যৌগপত্র** (*Palmate Compound leaf*) বলা হয়।



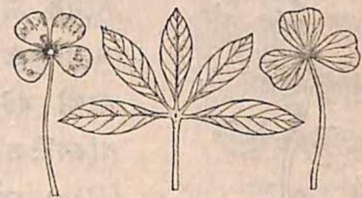
৫৬নং চিত্র—করতলাকার-জাতীয় একক-পত্রের খণ্ডন দেখানো হয়েছে: ক, করতলাকারে খণ্ডিত; খ, করতলাকারে উপখণ্ডিত; গ, করতলাকারে অতিখণ্ডিত; ঘ, করতলাকার যৌগপত্র।

পক্ষল-যৌগপত্র আবার পাঁচ-ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) যখন পত্রগুলি পত্রক-কক্ষের দুইপাশে পত্রকের সমান-সংখ্যক হয়, তখন পত্রকগুলি পত্রক-কক্ষের দুইপাশে পাখীর পালকের মতো বিপরীতমুখী হয়। পত্রক-কক্ষের আগায় জোড়া পত্রক থাকে। তেঁতুল গাছের পাতা এর উদাহরণ। এই ধরনের যৌগপত্রকে **অচূড় পক্ষল** (*Paripinnate*) বলা হয়। (২) যখন পত্রক-কক্ষের আগায় একটি মাত্র বেজোড় পত্রক থাকে, যেমন—গোলাপ ও অপরাজিতা গাছের পাতা এর উদাহরণ। এই ধরনের পক্ষল-যৌগপত্রকে **সচূড় পক্ষল** (*Imparipinnate*) বলা হয়। (৩) যখন পক্ষল-যৌগপত্রের প্রতিটি পত্রক পত্রের খণ্ডন-পদ্ধতি অনুযায়ী পুনরায় খণ্ডিত হয়ে ছোট ছোট পক্ষে (*Pinnules*) পরিণত হয়, তখন এইরকমের পক্ষল-যৌগপত্রকে **দ্বি-পক্ষল** (*Bipinnate*) পত্র বলে; যথা—বাবলা ও লজ্জাবতী গাছের পাতা। (৪) যখন দ্বি-পক্ষল পত্রের পক্ষলগুলি তৃতীয়বার, পত্রের খণ্ডন-পদ্ধতি অনুসারে আবার খণ্ডিত হয়ে, আরও ছোট ছোট পক্ষে পরিণত হয়, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে **ত্রি-পক্ষল** (*Tripinnate*) পত্র বলে; যথা—সজিনা গাছের পাতা। (৫) যখন পক্ষলগুলি বারে বারে বিভক্ত হয়ে অতি সূক্ষ্ম পক্ষলে পরিণত

হয় এবং সাধারণতঃ এই খণ্ডন-প্রক্রিয়া তিনবারের চেয়েও বেশী হয়, তখন এইরূপ পক্ষল-যৌগপত্রকে বলে অতিযৌগিক (*Decompound*) পত্র ; যথা—ধনে ও মৌরী গাছের পাতা।



৫৭নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকারের পক্ষল-যৌগপত্র দেখানো হয়েছে।



৫৮নং চিত্র—বিভিন্ন প্রকারের করতলাকার যৌগপত্র দেখানো হয়েছে।

করতলাকার যৌগপত্রের পক্ষলগুলি বৃন্তের আগায় বা বৃন্তের অগ্রবিন্দুতে হাতের আঙুলের মতো মিলিত হয়। পত্রকের সংখ্যা অনুসারে এটি নানা ধরনের দেখা যায়; যথা ঃ (১) একপত্রক (*Uni-foliate*)—যখন করতলাকার যৌগপত্রে একটি পত্রক (*Leaflet*) থাকে, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে একপত্রক বলা হয়; যথা—কমলালেবু গাছের পাতা। (২) দ্বি-পত্রক (*Bifoliate*)—যখন করতলাকার যৌগ-পত্রে দুটি মাত্র পত্রক থাকে, তখন সেইরকমের যৌগপত্রকে দ্বি-পত্রক বলে ; যথা—রঙ্গন গাছের পাতা। (৩) ত্রি-পত্রক (*Trifoliate*)—যখন করতলাকার যৌগপত্রে তিনটি মাত্র পত্রক থাকে, তখন এইরকমের যৌগ-পত্রকে বলে ত্রি-পত্রক ; যথা—আমরুল শাকের পাতা। (৪) চতুষ্পত্রক (*Quadri-foliate*)—যখন করতলাকার যৌগপত্রে চারটি মাত্র পত্রক থাকে, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে চতুষ্পত্রক বলা হয় ; যথা—শুশনি শাকের পাতা। (৫) অঙ্গুলাকার (*Digitate*)—যখন করতলাকার যৌগ-পত্রে চারটি পত্রকের চেয়েও বেশী সংখ্যায় পত্রক-বৃন্তের অগ্রবিন্দুতে যুক্ত হয়, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে অঙ্গুলাকার বলা হয় ; যথা—শিমুল গাছের পাতা।

পরিবর্তিত পত্র (Modified leaf)

পাতার ফলক উদ্ভিদের নানা কাজের সাহায্যের জন্য পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দেখা গেছে, প্রায় আট রকমের পাতায় এই রূপান্তর ঘটে ; যথা—



৫৯নং চিত্র—কড়াইশুঁটির ফলক-আকর্ষ।

(১) ফলক-আকর্ষ (*Leaf-tendrils*) : অনেক উদ্ভিদের পাতার ফলক সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ফলক-আকর্ষে পরিবর্তিত হয়। জংলী মটর-উদ্ভিদের সমস্ত পাতাই সরু আকর্ষে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। সাধারণ মটরে (*Pea*) যৌগপত্রের শেষ তিন থেকে পাঁচটি পত্রক আকর্ষে পরিণত হয়।

(২) ছোট কাঁটা (*Spines*) : এগুলি খুব সূক্ষ্ম কাঁটা। পাতার ফলকের এক অংশ বা সমস্তটাই ছোট কাঁটায় পরিণত হয়। শাকভোজী প্রাণীদের মুখ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যই 'বাঁচার অস্ত্র' হিসেবে জীব-বিজ্ঞানীরা ছোট কাঁটাকে উদ্ভিদের একটা অস্ত্র ব'লে মনে করেন।

(৩) হুক (*Hooks*) : বিগোনিয়া বা কণ্টিকারী উদ্ভিদের যৌগ-পত্রের শেষ তিনটি পত্রক বেশ সূক্ষ্ম, ধারালো হুকে পরিবর্তিত হয়।

(৪) মূল-সদৃশ অঙ্গ (*Root-like structures*) : সালভিনিয়া এবং জলজ উদ্ভিদের জলে ডুবে-থাকা পাতা-ফলকগুলি সরু মূলে রূপান্তরিত হয় এবং মূলের মতো জল শোষণ করে। এদের প্রকৃত মূল নেই।

(৫) স্থূল পত্র (*Fleshy leaves*) : পাথরকুঁচি, বিগোনিয়া ও কয়েক জাতের লিলির পাতার ফলকগুলি বেশ পুরু হয়। এরা পুরু পাতার ভেতর প্রচুর জল ধ'রে রাখতে পারে।

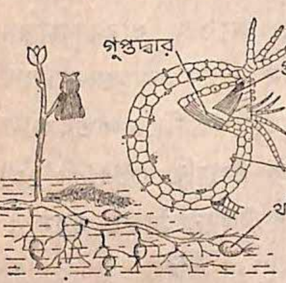
(৬) ঘটপত্রী (*Pitcher*) : ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতা একটি ঘটে পরিণত হয়। এর বৃন্তটি প্যাঁচালো আকর্ষে পরিণত হয়ে প্রসারিত ফলকে শেষ হতে দেখা যায়। ঘটের মুখে একটি ঢাকনাও দেখা যায়।

ফলকের অগ্রভাগই ঘটে পরিণত হয়। এই ধরনের ঘট তৈরি ক'রে উদ্ভিদ্ নাইট্রোজেন খাদ্য পাওয়ার জন্য পোকা-মাকড় ধরে।



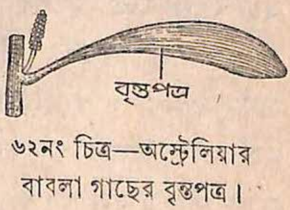
৬০নং চিত্র—ঘটপত্রী।

(৭) থলি (*Bladder*) : এই থলি-বিশিষ্ট উদ্ভিদের নাম পাতা-ঝাঁজি (*Bladder* or *Utricularia*)। এটি মূলহীন জলীয় বিরুৎশ্রেণীর উদ্ভিদ্। পুরোনো পুকুরে এদের দেখা যায় এবং পাতাগুলি যৌগ। এই রকমের যৌগপত্রের পত্রকগুলি ছোট ছোট থলিতে রূপান্তরিত হয়। এই থলিগুলির সামনে একটি অন্তর্মুক্ত ফাঁদি-দুয়ার বা গুপ্তদ্বার (*Trap-door*) থাকে। পুকুরের কীটগুলি আশ্রয়ের জন্য থলির ভেতর গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে। গুপ্তদ্বারটি অন্তর্মুখ হওয়াতে, থলির ভেতর হতে কীটগুলি আর বের হতে পারে না। থলির ত্বকে জারক-গ্রন্থি ও শোষণ-গ্রন্থি থাকায়, এরা আবদ্ধ প্রাণিদেহ হতে খাদ্য-রস শোষণ ক'রে পরিপাক করে।



৬১নং চিত্র—পাতা-ঝাঁজি ও তার থলি।

(৮) বৃন্তপত্র (*Phyllode*) : বাবলা-জাতীয় গাছের যৌগিক পাতা বের হওয়ার পরই ঝরে পড়ে যায়। তখন এর বৃন্তটি চ্যাপটা হয়ে সবুজ পাতায় পরিণত হয়। এটি পাতার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে এবং দেখতে প্রায় পাতার মতো। এই ধরনের চ্যাপটা বৃন্তকেই বৃন্তপত্র বলে।

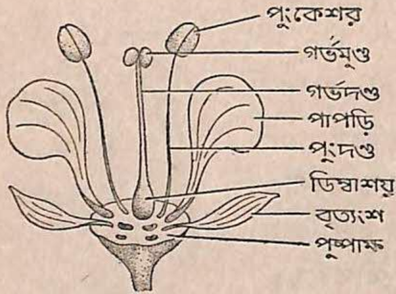


৬২নং চিত্র—অস্ট্রেলিয়ার বাবলা গাছের বৃন্তপত্র।

ফুল (Flower)

উদ্ভিদের জনন-প্রক্রিয়া কার্যকরী করার জন্য বিটপের আকৃতি অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হয়। বিটপের এই পরিবর্তিত রূপকেই ফুল বলে। ফুলের বিভিন্ন অংশ নিম্নরূপ :

ফুলের বিভিন্ন অংশ (**Parts of a typical flower**)ঃ



৬৩নং চিত্র—একটি আদর্শ ফুলের বিবিধ অঙ্গ দেখানো হয়েছে।

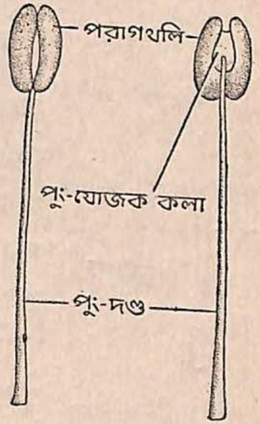
একটি আদর্শ ফুলের চারিটি অংশ বা স্তবক (*Whorl*) থাকে। স্তবকগুলি পুষ্পাক্ষের উপর একের পর এক সর্পিলভাবে সাজানো থাকে। স্তবকগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) বৃতি (*Calyx*) ঃ ফুলের গোড়ায় ছোট সরু পাতার মতো অঙ্গ থাকে। এদের বৃতি (*Calyx*) বলা হয়। বৃতির প্রতিটি অংশকে বলা হয় **বৃত্যংশ** (*Sepal*)। প্রতিটি বৃত্যংশ যখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন এদের **যুক্ত-বৃত্যংশ** (*Gamosepalous*) বলা হয়; যেমন—ধুতুরা ফুলের পাঁচটি বৃত্যংশ যুক্ত হয়ে নলের মতো আকার ধারণ করে। আবার যখন বৃত্যংশগুলি যুক্ত থাকে না, তখন এদের **অযুক্ত-বৃত্যংশ** (*Polysepalous*) বলে। জবা ফুলের পাঁচটি বৃত্যংশের নিচে কতকগুলি সরু পাতার মতো অংশ দেখা যায়। এগুলিকে **উপবৃতি** (*Epicalyx*) বলে। ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন বৃতি কুঁড়িকে ঠাণ্ডা, গরম ও কীট-পতঙ্গ হতে রক্ষা করে। এটাই বৃতির কাজ।

(২) **দলমণ্ডল** (*Corolla*)ঃ বৃতির ভিতরে যে স্তবকটি চক্রাকারে থাকে, সেটিকে **দলমণ্ডল** বলে। দলমণ্ডলের প্রতিটি অংশকে দল বা পাপড়ি (*Petal*) বলা হয়। মটর ফুলের পাপড়ি বড়-ছোট আকারের হয় ব'লে মটর ফুলের পাপড়িকে **অসম** (*irregular*) পাপড়ি বলে। কিন্তু জবা ফুলের পাঁচটি পাপড়ি আকারে সমান হওয়ায় এদের **সম** (*regular*) পাপড়ি বলে। মটর ফুলের পাঁচটি পাপড়ি পরস্পর যুক্ত নয়, তাই এদের **অযুক্ত-দল** (*Polypetalous*) বলে। সেইরকম ধুতুরা ফুলে পাঁচটি দল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং ঘণ্টাকার বা ফানেলের মতো। এদের **যুক্ত-দল** (*Gamopetalous*) বলে। বৃতি ও দলমণ্ডল ফুলের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক। এই দুই স্তবক ফুলের বংশ-বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে

সাহায্য করে না ব'লে স্তবক-দুটিকে **সাহায্যকারী বা অতিরিক্ত স্তবক** (*Accessory whorl*) বলা হয়।

(৩) **পুং-স্তবক** (*Androecium*)ঃ ফুলের তৃতীয় স্তবকটি দ্বিতীয় স্তবকের ভেতর থাকে এবং একে **পুং-স্তবক** বলা হয়। পুং-স্তবকের মাথায় টুপি-পরা নলের মতো অংশগুলিকে **পুংকেশর** (*Stamen*) বলে। মটর ফুলে দশটি পুংকেশরের মধ্যে নয়টি যুক্ত এবং একটি পুংকেশর আলাদা থেকে পুং-স্তবককে দুটি সমষ্টিতে পরিণত করে। যখন পুংকেশরগুলি তার নলের সাহায্যে পাপড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন এদের **দললগ্ন পুংকেশর** (*Epipetalous*) বলে। ধুতুরা ফুলের পাঁচটি পুংকেশর তার পাপড়ির সঙ্গে যুক্ত। পুংকেশরের দুটি অংশ থাকে। এর লম্বা দণ্ডটিকে **পুং-নালী** (*Filament*) বলা হয়। পুং-নালীর মাথার উপরের থলিটিকে **পরাগধানী** (*Anther*) বলে। পরাগধানীর ভেতরে ফুলের রেণু (*Pollen grain*) থাকে। রেণুর মধ্যে থাকে পুং-ফুলের স্বভাব ও পুং-নিউক্লিয়স।

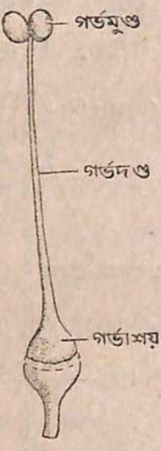


৬৪নং চিত্র—পুংকেশরের বিবিধ অঙ্গ।

(৪) **স্ত্রী-স্তবক** (*Gynoecium*)ঃ ফুলের চতুর্থ স্তবকটির নাম স্ত্রী-স্তবক। পুং-স্তবকের মতো স্ত্রী-স্তবকেও কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ থাকে; এদের প্রত্যেককে **গর্ভকেশর** (*Carpel*) বলে। গর্ভকেশরগুলি দেখতে লম্বা নলের বা ফ্লাস্কের মতো। এদের মূল স্থূল। গর্ভ-কেশরের এই স্থূলাকার অংশকে **গর্ভকোষ** (*Ovary*) বলে। গর্ভকোষের মধ্যে থাকে ছোট ছোট দানার মতো **ডিম্বক** (*Ovule*)। গর্ভকোষ হতে সরু একটি নল বের হয়ে ফুলের পাপড়ি ভেদ ক'রে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই নলটিকে গর্ভকেশরের **গর্ভদণ্ড** (*Style*) বলে। গর্ভদণ্ডের আগাটি স্ফীত বা প্রসারিত। এই অংশকে গর্ভকেশরের **গর্ভমুণ্ড** (*Stigma*) বলে। জবা ফুলে পাঁচটি পরস্পর-যুক্ত গর্ভকেশর থাকে। এই ধরনের গর্ভকেশরকে সিনকারপাস (*Syncarpus*) বলে। অযুক্ত গর্ভকেশরকে **অ্যাপোকারপাস**

(*Apocarpus*) বলে। ধুতুরা ফুলে দুটি গর্ভকেশর থাকে এবং এ-দুটি যুক্ত।

যখন ফুলে উপরোক্ত চারটি স্তবক থাকে তখন ফুলটিকে আমরা **সম্পূর্ণ ফুল** (*Complete flower*) বলি। আবার যে ফুলে চারটি স্তবকের মধ্যে যে-কোন একটি স্তবক থাকে না, সেইরকমের ফুলকে **অসম্পূর্ণ** (*Incomplete flower*) বলা হয়। জবা, ধুতুরা, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলগুলি সম্পূর্ণ। আবার রজনীগন্ধা, কুমড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলগুলি অসম্পূর্ণ। সাধারণতঃ যে-সব ফুলে পুংকেশর এবং গর্ভকেশর দুই-ই থাকে, তাদের বলা হয় **উভলিঙ্গ** (*Hermaphrodite*) ফুল। আবার যখন ফুলে পুংকেশর কিংবা গর্ভকেশর থাকে, তখন সেইরকমের ফুলকে **একলিঙ্গ** (*Unisexual*) ফুল বলা হয়। সাধারণতঃ **সম্পূর্ণ ফুলগুলিই উভলিঙ্গ হয়**; যেমন—মটর, ধুতুরা, জবা ইত্যাদি। শশা, কুমড়া, ডালিম প্রভৃতি উদ্ভিদের **ফুলগুলি একলিঙ্গ**। যে-সব ফুলে কেবলমাত্র পুংকেশর থাকে কিন্তু গর্ভকেশর থাকে না, তাদের **পুং-ফুল** বা **পুরুষ-ফুল** (*Male* or *Staminate flower*) বলে। আবার যে-সব ফুলে কেবলমাত্র গর্ভকেশর থাকে, পুংকেশর থাকে না, তাদের **স্ত্রী-ফুল** (*Female* or *Pistillate*) বলে। কুমড়া গাছে স্ত্রী-ফুল এবং পুং-ফুল দুই-ই দেখা যায়। কতকগুলি ফুলে পুংকেশর বা গর্ভকেশর কিছুই থাকে না। তদের **ক্লীব ফুল** (*Neuter flower*) বলে।



৬৫নং চিত্র—গর্ভ-পত্রের বিবিধ অঞ্চল।

যখন ফুলের প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি, যেমন—বৃত্যংশ বা পাপড়ি ইত্যাদি আকারে সমান হয়, তখন সেইরকমের ফুলকে **সমাঙ্গ** (*regular*) বলা হয়। জবা, ধুতুরা, শিয়ালকাঁটা, আতা ও বেগুন উদ্ভিদের ফুলগুলি সমাঙ্গ। আবার যখন কোন ফুলের প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি অসমান হয়, অর্থাৎ ছোট-বড় হয়, তখন তাদের বলা হয় **অসমাঙ্গ** (*irregular*) ফুল; যেমন—জংলী মটর, ছোলা, বক, অতসী ইত্যাদি। আবার

যখন ফুলের বৃত্যংশ ও পাপড়ি ব'লে কোন অংশই থাকে না এবং তার পরিবর্তে পাপড়ির মতো কতকগুলি অংশ দেখা যায়, এই অংশগুলিকে **পুষ্পপুট** বা **পেরিয়্যান্থ** (*Perianth*) বলা হয়।

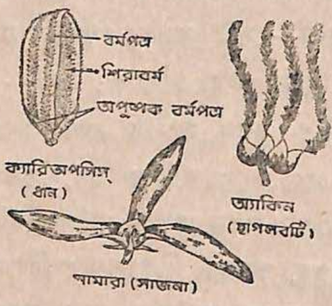
ফল (Fruits)

পুষ্ট ডিম্বাশয়কেই উদ্ভিদের ফল বলা হয়। ফুলের বিবিধ অংশ ডিম্বকের মতো নিষিক্তের উত্তেজনায় পরিপক্ব হয়ে ফলকে পরিবেষ্টিত ক'রে থাকে। চালতার যে অংশ আমরা খাই—সেটি ফুলের বৃত্যংশ। সেইরকম আপেলের যে অংশ আমরা খাই—সেটি ফুলের পুষ্পাধার। নানা রকমের ফলকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ; যথা—

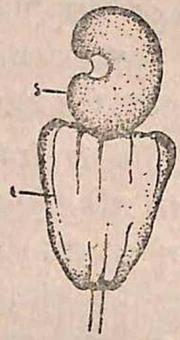
(১) **সরল ফল** (*Simple fruit*) : যখন ফুলের একটি মাত্র ডিম্বাশয় থাকে এবং যখন সেটি পরিপক্ব হয়ে ফলে পরিণত হয়, তখন এই ধরনের ফলকে সরল ফল বলে। আবার যখন ফুলের গর্ভপত্রগুলি মিলিত হয়ে একটি প্রকোষ্ঠে পরিণত হয়, তখনও ডিম্বাশয় পরিপক্ব হলে, তাকেও সরল ফল বলা হয়। ফলের বাইরের আবরণকে **ফলত্বক্** (*Pericarp*) বলা হয়। ফলত্বক্ কোন কোন ফলে **নীরস** (*dry*) বা **সরস** (*fleshy*) হয়। আবার কখনও কখনও সরল ফল পরিপক্ব হবার পরে আপনা হতেই ফেটে যায় এবং তার ভেতরকার বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ফলকে **বিদারী ফল** (*Dehiscent fruit*) বলা হয়। আবার কয়েকপ্রকার ফল পরিপক্ব হবার পরেও ফেটে তার বীজ ছড়ায় না, সেইরকমের ফলকে **অবিদারী ফল** (*Indehiscent fruit*) বলা হয়। সরল ফলগুলিকে তার ত্বকের বৈশিষ্ট্য ও বীজ-ছড়ানো পদ্ধতি অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন—

(২) **নীরস অবিদারী ফল** (*Dry indehiscent fruit*)—এই ধরনের ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। এরা তিন প্রকারের ; যথা : (i) অ্যাকিন (*Achene*)—এই ধরনের ফল অধিগর্ভ এবং এক-কোষ্ঠ-বিশিষ্ট ডিম্বাশয়-যুক্ত ফুল হতে উৎপন্ন হয়। ফলে ত্বক্ ও বীজের বীজত্বক্ পৃথক্ থাকে। ছাগলবটি, কালজিরা ফলগুলি এর উদাহরণ। (ii) ক্যারিয়প্‌সিস (*Caryopsis*)—এই ফলটি অ্যাকিনেরই মতো, কেবলমাত্র এই ফলের

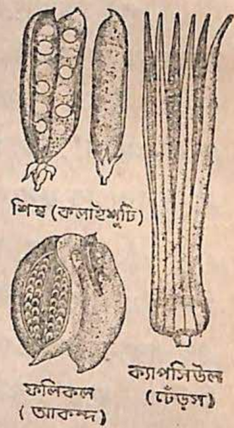
ত্বক্ ও বীজত্বক্ এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, ছুটিকে আলাদা করা যায় না। ধান, ভুট্টা, গম ইত্যাদি ক্যারিয়প্‌সিস-জাতীয় ফল। (iii) **নাট** (*Nut*)—এক, ছুই বা ততোধিক ডিম্বাশয়-বিশিষ্ট ফুল হতে এই ধরনের ফলের সৃষ্টি। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। ফলের ত্বক্‌টি শক্ত ও কাঠের মতো। রিটা, গর্জন, ওক, হিজলী বাদাম ইত্যাদি নাট ফলের উদাহরণ।



৬৬নং চিত্র—উদ্ভিদের সরল অবিদারী ফল।



৬৭নং চিত্র—নাট-জাতীয় ফল (হিজলী বাদাম)। ১, ফল ; ২, পুষ্পাক্ষ।

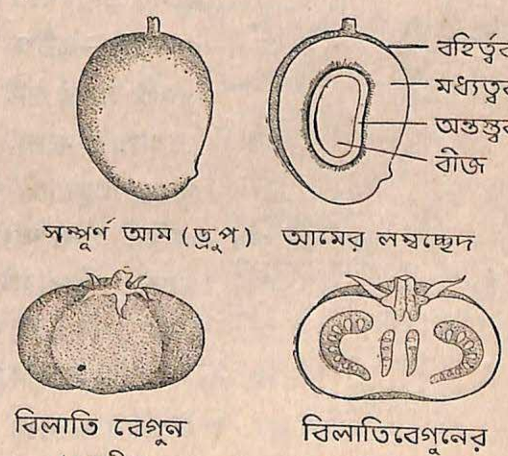


৬৮নং চিত্র—উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল।

(৩) **নীরস বিদারী ফল** (*Dry dehiscent fruit*) : প্রধানতঃ তিনপ্রকারের নীরস বিদারী ফলের বিবরণ দেওয়া হ'ল ; যেমন : (i) **শিম্ব** (*Legume*)—এইরকমের ফল একটি মাত্র গর্ভপত্র হতে সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয় অধিগর্ভ এবং এক-কোষ্ঠ-বিশিষ্ট হয়। ফল পেকে গেলে এটি মাঝের সন্ধি দিয়ে ছুই ভাগে ফেটে যায়। বক, অতসী, মটর, ছোলা প্রভৃতির ফল শিম্ব-জাতীয়। (ii) **ফলিকল** (*Follicle*)—এটি একটি মাত্র গর্ভপত্র হতে সৃষ্টি হয়। গর্ভপত্রের ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং এক-কোষ্ঠ-বিশিষ্ট। এই ফলগুলি নিজের সন্ধি দিয়ে না ফেটে, ফলের অঙ্কীয় দিকের সন্ধিপথে ফেটে ভাগ হয়ে যায়। আকন্দ উদ্ভিদের ফল এর আদর্শ উদাহরণ। (iii) **ক্যাপসিউল** (*Capsule*)—এটি ছুই বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্র হতে উৎপত্তি-লাভ করে। ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং বহু-কোষ্ঠ-বিশিষ্ট। ফল পাকলে, ফলত্বক্ প্রকোষ্ঠ অনুসারে পাটে পাটে

ফেটে যায়। কার্পাস, ঢেঁড়স ও ধুতুরা উদ্ভিদের ফল ক্যাপসিউল-জাতীয় ফল।

(ক) **সরস ফল** (*Fleshy fruit*) : সরস ফলের ত্বক্ পুরু ও রসালো। ফলত্বক্‌টি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—(i) **বহিঃত্বক্** (*Endocarp*) বা বাইরের খোসা ; (ii) **মধ্যত্বক্** (*Mesocarp*) বা ফলত্বকের মাঝের অংশ। এই অংশটি বহিঃত্বকের নিচে থাকে। এটি সাধারণতঃ রসালো। (iii) **অন্তঃত্বক্** (*Endocarp*) বা ফলত্বকের ভিতরের অংশ। এটি সাধারণতঃ কঠিন। সরস ফল কখনও ফাটে না। ফল পেকে গেলে সেটি মাটিতে পড়ে যায় এবং ত্বক্‌টি মাটির সংস্পর্শে পচে গেলে, ফলের ভেতরকার বীজগুলি মাটির সংস্পর্শে এসে নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি করে। বহু সরস ফলের মধ্যে দুই রকমের সরস ফলের উদাহরণ দেওয়া হ'ল : (i) **ড্রুপ** (*Drupe*)—ফলের ত্বক্‌টি বহিঃত্বক্, মধ্যত্বক্ ও অন্তঃত্বকে বিভেদিত। আম, কুল, লিচু ও পিচ গাছের ফল ড্রুপ-জাতীয়। আমের বহিঃত্বক্‌টি পাতলা ও মধ্যত্বক্‌টি রসালো এবং সুমিষ্ট। কতকগুলি ড্রুপ-জাতীয় ফলের বহিঃত্বক্‌টি পুরু ও কঠিন। এটি ফলের চারপাশ বেষ্টন ক'রে রাখে। নারকেল, তাল, সুপারি ফলও ড্রুপ-জাতীয়। এদের মধ্যত্বক্‌টি তন্তুময়। নারকেলের তন্তুময় মধ্যত্বক্‌টি হতে দড়ি তৈরি হয়। তন্তুময় মধ্যত্বক্-বিশিষ্ট ফলগুলিকে **তন্তুময় ড্রুপ** (*Fibrous drupe*) বলা হয়। (ii) **বেরি** (*Berry*)—এইরকমের ফল একটি গর্ভপত্র বা যুক্তগর্ভপত্র হতে উৎপত্তি-লাভ করে। এর বহিঃত্বক্ পাতলা ও

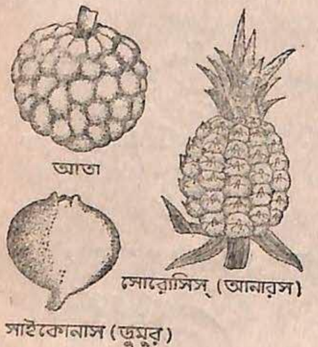


৬৯নং চিত্র—উদ্ভিদের সরল সরস ফল।

মসৃণ। মধ্যত্বক্ ও বহিঃত্বক্ কোন কোন ফলে যুক্ত থাকে। বিলাতী বেগুন (টম্যাটো), বেগুন, আঙুর, কলা, পেয়ারা, খেজুর, পেঁপে প্রভৃতি ফল বেরি-জাতীয়।

(খ) **গুচ্ছিত ফল** (*Aggregate fruit*) : এই ধরনের ফল ও ফুল অনেকগুলি যুক্তগর্ভপত্র হতে উৎপত্তি-লাভ করে। তাই প্রতিটি গর্ভপত্রের ডিম্বাশয় হতে একটি ক'রে সরল ফলের উৎপত্তি হয়। সরল ফলগুলি গুচ্ছিতভাবে পুষ্পাধারের উপর থাকে। প্রকৃতপক্ষে গুচ্ছিত ফল কতকগুলি ছোট ছোট সরল ফলের গুচ্ছ মাত্র। ছাগলবটি ও আতা গাছের ফল গুচ্ছিত ফলের উদাহরণ।

(গ) **যৌগিক ফল** (*Multiple fruit*) : যখন সমস্ত ফুলের পুষ্পবিন্যাসটি পেকে গিয়ে একটি মাত্র ফলে পরিণত হয়, তখন এই-রকমের ফলকে যৌগিক ফল বলা হয়। যৌগিক ফল দুই রকমের ; যথা : (i) **সোরোসিস** (*Sorosis*)—প্রচুর স্ত্রী-পুষ্প-সন্নিবিষ্ট পুষ্পবিন্যাস পেকে গিয়ে সোরোসিস ফলের সৃষ্টি করে। স্ত্রী-পুষ্পগুলি মঞ্জরীদণ্ডে বৃত্তাকারে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। মঞ্জরীদণ্ড-সমেত সমস্ত পুষ্পবিন্যাস পেকে একটি বিরাট যৌগিক ফলে বিকাশ-লাভ করে। আনারস ও কাঁঠাল সোরোসিস ফলের উদাহরণ। (ii) **সাইকোনাস** (*Syconus*)—এটিও সম্পূর্ণ পুষ্পবিন্যাস পেকে একটি ফলের সৃষ্টি করে। দেখতে এটি একটি পেয়ালার মতো এবং পেয়ালার ভেতরের গাত্রে প্রচুর স্ত্রী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প জন্মায়। প্রতিটি পুষ্প ফলে পরিণত হয়। পেয়ালার মতো পুষ্পাধারটি পুষ্ট হয়ে যৌগিক ফলের সৃষ্টি করে। ডুমুর, বট ও অশ্বত্থ গাছের ফলগুলি সাইকোনাসের উদাহরণ।



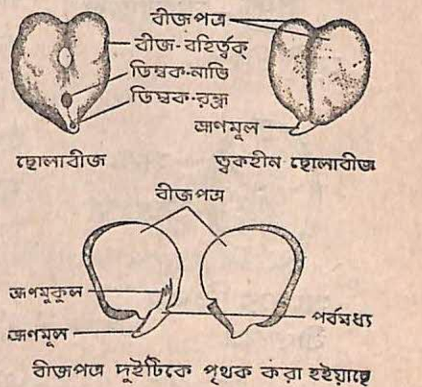
৭০নং চিত্র—গুচ্ছিত ও যৌগিক ফল।

বীজ (Seeds)

বীজপত্র অনুসারে বীজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরিপক্ক ডিম্বককেই বীজ বলা হয়। আবরণের ভিতর ভ্রূণ (*Embryo*) থাকে।

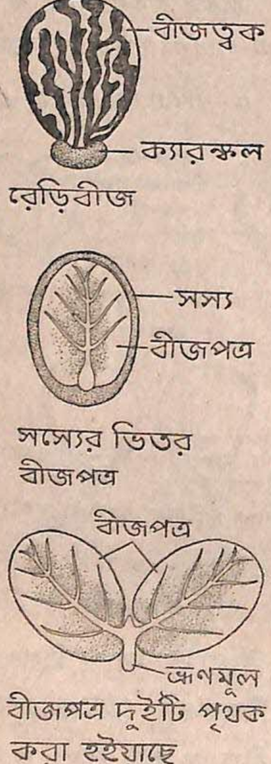
বীজের মধ্যে ভ্রূণ সুপ্ত (*dormant*) অবস্থায় থাকে। বীজের উপরে পর পর দুটি আবরণ থাকে। কোন কোন বীজে ভ্রূণের দুটি ক'রে বীজপত্র থাকে। দ্বিবীজপত্রী (*Dicotyledon*) উদ্ভিদের বীজে দুটি ক'রে বীজপত্র (*Cotyledon*) থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের বীজে একটি ক'রে বীজপত্র থাকে। সেইরকমের উদ্ভিদকে একবীজপত্রী (*Monocotyledon*) উদ্ভিদ্ বলে। মটর, ছোলা, তেঁতুল, রেড়ি ও কুমড়া দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্। আবার ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদ্। অনেক বীজে বীজপত্র ব্যতীত সস্য (*Endosperm*) থাকে। এদের সস্যল বীজ বলে, আর যেগুলিতে থাকে না, তাদের অসস্যল (*Non-endospermic*) বলে।

ছোলা-বীজের গঠন (*Structure of a gram-seed*)ঃ এটি অসস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজ। এর বাইরের বীজত্বক্‌কে **বীজ-বহিঃত্বক্** (*Testa*) বলা হয়। বীজ-বহিঃত্বক্‌টি পুরু ও ধূসর রঙের। বীজ-বহিঃত্বকের নিচে **বীজ-অন্তঃত্বক্** (*Tegmen*) পাতলা এবং স্বচ্ছ। বহিঃত্বকের উপর একটি সূক্ষ্ম গোলাকার চাপা ক্ষেত্র দেখা যায়। এই চাপা অংশটিকে **ডিম্বক-নাভি** বা **হিলাম** (*Hilum*) বলা হয়। হিলামের উপরের দিকে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়। বীজটিকে একদিন জলে ভিজিয়ে রাখার পরে, সেটিকে দুই আঙুল দিয়ে চাপ দিলে, হিলামের মধ্যস্থ ছিদ্রপথে জল বের হতে দেখা যায়। এই ছিদ্রটিকে **ডিম্বক-রন্ধ্র** (*Micropyle*) বলা হয়। বীজত্বক্ দুটি অপসারিত করলে, বীজপত্র দুটি দেখা যায়। ছোলার বীজপত্র দুটি পুরু ও স্থূল। বীজপত্র দুটি ধীরে ধীরে ফাঁক করলে, দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাঁকা দণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। এই দণ্ডটি বীজপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এটিকে বীজের ভ্রূণাক্ষ (*Axis*) বলা হয়। ভ্রূণাক্ষের যে প্রান্তটি বীজপত্র দুটিকে অতিক্রম ক'রে



৭১নং চিত্র—ছোলা-বীজের বহিঃ ও অন্তঃগঠন।

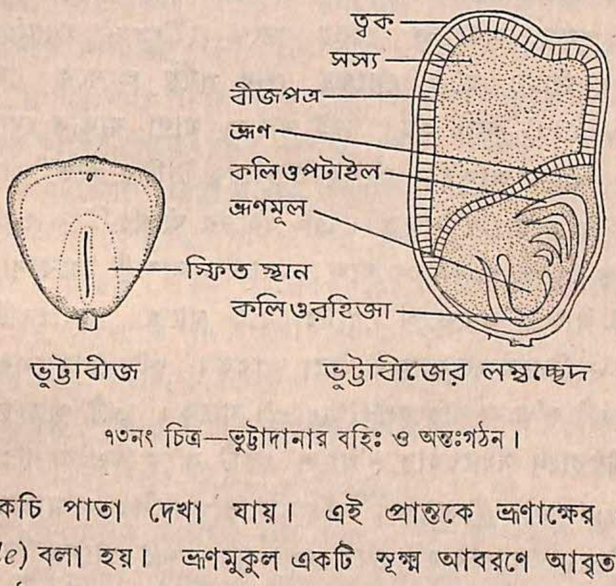
ডিম্বক-রন্ধ্রের দিকে থাকে, সেই অংশকে **ভ্রূণমূল** (*Radicle*) বলা হয়। ভ্রূণের বিপরীত প্রান্তটি বীজপত্রের মধ্যে থাকে। এই প্রান্তটিকে ভ্রূণাক্ষের **ভ্রূণ-মুকুল** (*Plumule*) বলা হয়। ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল হতে যথাক্রমে উদ্ভিদের মূল ও বিটপের উৎপত্তি হয়। ভ্রূণাক্ষের সঙ্গে বীজপত্রের সংযোগ-স্থানটিকে **পর্বস্থান** (*Nodal zone*) বলে। ভ্রূণমুকুল হতে ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান পর্যন্ত অংশকে **বীজপত্রাধিকাণ্ড** বা **এপিকোটাইল** (*Epicotyle*) বলে। আবার ভ্রূণাক্ষের পর্বস্থান হতে ভ্রূণমূল পর্যন্ত অপর অংশটিকে **বীজপত্রাবকাণ্ড** বা **হাইপোকোটাইল** (*Hypocotyle*) বলে। ছোলার বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে এর বীজপত্র দুটি মৃত্তিকার নিচে থাকে। কারণ, অঙ্কুরোদগমের সময়ে ভ্রূণের বীজপত্রাধিকাণ্ড বা এপিকো-টাইল অংশ বৃদ্ধি না পাওয়ায়, বীজপত্র দুটি উপরে উঠতে পারে না। এইরকমের অঙ্কুরোদ্গমকে **মৃদ্বর্তী** (*Hypogeal* ; Hypo = below, ge = earth) বলা হয়।



৭২নং চিত্র—রেড়িবীজের বহিঃ ও অন্তঃগঠন।

ভুট্টাদানার গঠন (*Structure of a Maize-grain*) : ভুট্টাদানা প্রকৃতপক্ষে একটি আস্ত ক্যারিয়প্সিস ফল। তাই এটিকে বীজ না ব'লে দানা বলে। প্রতিটি দানা আকারে চ্যাপটা এবং স্থূল। দানার বাইরের ত্বক্‌টি সোনালী রঙের। ত্বক্‌টি ফলত্বক্ ও বীজত্বক্ একত্র হয়ে গঠিত। ভুট্টাদানার একদিকে একটি আয়তাকার অংশের মাঝে দণ্ডের মতো একটি অঞ্চল দেখা যায়। এই অঞ্চলটিকে **ডেলটয়েড স্থান** (*Deltoid area*) বলা হয়। এই দণ্ডের উপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে ছুরি দিয়ে কাটলে, বীজটি সমদ্বিখণ্ডিত হয়। লেন্স-এর দ্বারা যে-কোন

একটি খণ্ডকে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখার পরে পরীক্ষা করলে, দেখা যাবে যে, খণ্ডটি একটি পাতলা পর্দার দ্বারা দুই অসমান অংশে বিভক্ত। এই পাতলা পর্দাটিকে স্কুটেলাম (*Scutellum*) বলা হয়। খণ্ডের বড় ও স্থূল অংশটি বীজের সস্য। সস্যের সঙ্গে স্কুটেলাম যুক্ত থাকে। স্কুটেলাম-ই ভুট্টাদানার বীজপত্র। খণ্ডের অপরধারে একটি সূক্ষ্ম দণ্ড দেখা যায়। এইটি ভুট্টার ভ্রূণাক্ষ। বীজপত্র বা স্কুটেলাম এবং ভ্রূণাক্ষ এই দুটিকে একত্র ক'রে ভুট্টার ভ্রূণ-অংশ বলা হয়। ভ্রূণে ভ্রূণাক্ষ অতি ক্ষুদ্র। এর



৭৩নং চিত্র—ভুট্টাদানার বহিঃ ও অন্তঃগঠন।

শীর্ষাগ্রে কচি পাতা দেখা যায়। এই প্রান্তকে ভ্রূণাক্ষের **ভ্রূণমুকুল** (*Plumule*) বলা হয়। ভ্রূণমুকুল একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত। একে **কলিওপ্টাইল** (*Coleoptile*) বলা হয়। ভ্রূণমুকুলের বিপরীত প্রান্তটিকে **ভ্রূণমূল** (*Radicle*) বলা হয় এবং এটিও একটি সূক্ষ্ম পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে। এই পর্দাটিকে **কলিওরহিজা** (*Coleorhiza*) বলে। স্কুটেলামের এক দিক সস্যের সঙ্গে সংযুক্ত এবং অন্য দিকটি ভ্রূণকে বেষ্টন ক'রে থাকে। এটি ধীরে ধীরে সস্যের ভিতর হতে খাদ্যরস ব্যাপন-প্রণালীর দ্বারা শোষণ করে এবং ভ্রূণাক্ষের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য যোগায়। ভুট্টাদানার অঙ্কুরোদ্গম-প্রণালী মৃদ্বর্তী (*Hypogeal*) প্রক্রিয়ায় হয় এবং দানাটি মাটির ভিতর থাকে।

দ্বিতীয় পর্ব : প্রাণীর বহির্গঠন

মাছ (Fish)

আদর্শ মাছ হিসেবে রুই মাছ সুবিদিত। পুষ্করিণীর মিষ্টি জলে এবং ছোট ছোট নদীতে ও পুকুরে এদের বাস। রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লেবিও-রোহিটা (*Labeo-rohita*)। এর দেহ বোটের মতো এবং দেহের দুইধার মসৃণ। বড় রুই মাছের দেহের রঙ লালচে দেখতে হয়। সমস্ত মাছটিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এর মাথা হতে কানকুয়া পর্যন্ত অংশকে মস্তক অংশ (*Head region*), কানকুয়ার পর হতে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত অঞ্চলকে ধড়ের অংশ (*Trunk region*) এবং পায়ুছিদ্রের পিছন হতে লেজের শেষ পর্যন্ত অংশকে লেজ অংশ (*Tail region*) বলা হয়। রুই মাছের মাথা ব্যতীত দেহের সর্বত্র গোলাকার আঁশে আবৃত। আঁশগুলি ছাদের টালির মতো একের উপর একটি ক'রে সাজানো থাকে। এই ধরনের আঁশগুলিকে চক্রাকার বা সাইক্লয়েড (*Cycloid*) আঁশ বলে। মাছের মাথাটি ত্রিকোণাকৃতি এবং মুখছিদ্রটি মাথার অগ্রভাগে পেটের দিকে থাকে। মুখছিদ্রটি উপরের চোয়াল ও নিচের চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ। দুই চোয়ালের সংযোগ-কোণে একটি শুঁড় বা বারবেল (*Barbel*) থাকে। এটি অত্যন্ত সুবেদী। মাথার শীর্ষস্থানে মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে ছিদ্র বা বহিঃনাসারন্ধ্র (*External nostril*) থাকে। বহিঃনাসারন্ধ্রের পিছনে মাথার দুইধারে একটি ক'রে গোলাকার বড় চোখ দেখা যায়। দুটি চোখের পিছনে একটি ক'রে বৃহৎ অর্ধচন্দ্রাকার কানকুয়া (*Operculum*) দেখা যায়। প্রতিটি কানকুয়ায় মুক্তধারে একটি পাতলা পর্দা থাকে। এই পর্দাটিকে ব্র্যাঙ্কিওস্টিগাল মেমব্রেন বলে। এটি মাছের ধড়ের উপর বিস্তারলাভ ক'রে ফুলকা-গহ্বরের (*Gill-cavity*) ছিদ্রটিকে বন্ধ ক'রে দেয়। রুই মাছের দু'পাশে লম্বালম্বিভাবে প্রতি কানকুয়া হতে একটি চক্‌চকে দাগ আঁশের উপর দিয়ে লেজের মূলে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই দাগের উপর স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রন্থি (*Sense-gland*) থাকে এবং দাগটিকে পার্শ্ব-স্পর্শেন্দ্রিয়-রেখা (*Laternal line of sense-organ*) বলে।

রুই মাছের দেহে পাঁচ রকমের পাখনা থাকে। এদের মধ্যে তু'রকমের পাখনা একজোড়া ক'রে থাকে এবং বাকী তিনটি বিজোড় পাখনা। প্রতিটি পাখনায় নরম কাঠির মতো হাড় থাকে। এদের ফিন-রে (*Fin-ray*) বলে। হাড়গুলি পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা। রুই মাছের কানকুয়ার পেছনে একজোড়া পাখনা থাকে। এটিকে **বক্ষ-পাখনা** বা **পেক্টোরাল ফিন** (*Pectoral fin*) বলা হয়। পেটের মধ্যবর্তী জায়গায় একজোড়া পাখনা দেখা যায়। এটিকে **শ্রোণী-পাখনা** (*Pelvic fin*) বলে। বক্ষ ও শ্রোণী-পাখনাকে **জোড়া পাখনা** (*Paired fins*) বলে। শ্রোণী-পাখনা এবং পায়ু-সংলগ্ন পাখনার মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রটিকে **পায়ুছিদ্র** (*Cloaca*) বলা হয়। পায়ুছিদ্রের পিছনের **বিজোড়** (*unpaired*) পাখনাটিকে **পায়ু-সংলগ্ন পাখনা** (*Anal fin*) বলা হয়। রুই মাছের লেজের শেষ অংশটি একটি পাখনায় আবৃত থাকে। লেজের পাখনাটিকে **লেজ-সংলগ্ন পাখনা** (*Caudal fin*) বলা হয়। এই পাখনাটি মাছের বৃহত্তম পাখনা এবং এটি মধ্যবর্তী অঞ্চল হতে তুই সমান ভাগে বিভক্ত। রুই মাছের পিঠের উপর একটি বিজোড় পাখনা থাকে। এই পাখনাকে **পৃষ্ঠ-পাখনা** (*Dorsal fin*) বলে।

রুই মাছ কর্ডাটা (*Chordata*) পর্বের অধীনে **পিসেস** (*Pisces*) শ্রেনীর অন্তর্ভুক্ত। মাছ মাত্রেই **অনুষ্ণশোণিত** (*Cold-blooded*) প্রাণী।

ব্যাঙ (Toad)

কুনো-ব্যাঙকে 'টোড' বলা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Buto melano stictus*। ব্যাঙ দেখতে কুৎসিত এবং চামড়ায় বিষাক্ত গন্ধ থাকে। কুনো-ব্যাঙের দেহের রঙ গাঢ় ছাইয়ের মতো। দেহটি মাথা ও ধড়ে বিভক্ত। এর গলা নেই। এর দেহের সর্বাঙ্গে কালো গোলাকার ফোড়ার মতো ছোট ছোট গুটি (*Warts*) থাকে। পিঠের চামড়া পেটের চেয়েও মোটা ও খসখসে। পিঠের দিকে গুটি বেশী ও পেটের দিকে গুটি কম। কুনো-ব্যাঙ উভচর প্রাণী ও গুটিগুলি এদের বৈশিষ্ট্য। কুনো-ব্যাঙকে লম্বালম্বিভাবে সমান তু'-ভাগে ভাগ করা যায়, তাই এদের দেহ দ্বিপার্শ্বরূপে প্রতিসম। কুনো-ব্যাঙের মাথাটি অর্ধবৃত্তের মতো। এর মুখছিদ্রটি মাথার

নিচে ও মুখছিদ্রের সংযোগ-কোণ চোখ ছাড়িয়ে আরও পিছনে থাকায় ব্যাঙের হাঁ-মুখটি বিরাট। মাথার শীর্ষদেশের মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে বহিঃনাসারন্ধ্র থাকে। প্রতিটি নাসারন্ধ্র **নাসাপথে** (*Nasal Passage*) মুখ-বিবরের ভিতরে অন্তঃ-নাসারন্ধ্রে মিলিত হয়েছে। বহিঃ-নাসারন্ধ্রের পেছনে দুইধারে একটি ক'রে বড় গোলাকার ও ড্যাবডেবে চোখ থাকে। চোখে তিনটি ক'রে পর্দা থাকে। ঠিক চোখের পেছনে একটি ক'রে গোলাকার পাতলা মসৃণ চামড়া কানের ছিদ্রটিকে ঢেকে রাখে। এটিকে **কর্ণপটহ** (*Tympanic membrane*) বলে। কর্ণপটহের ঠিক পিছনে একটি ক'রে লম্বাকার গ্রন্থি দেখা যায়। এর নাম **প্যারোটিড গ্রন্থি** (*Parotid gland*)। গুটিগুলি হতে সর্বদা রস নিঃসৃত হয় ব'লে ব্যাঙের চামড়া সবসময়ই সিক্ত থাকে।

ব্যাঙের দুটি পা মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থল হতে বের হয়েছে। এটি ব্যাঙের **অগ্রপদ** (*Forelimb*)। অগ্রপদটি যথাক্রমে : (i) **পুরোবাহু** (*Fore-arm*), (ii) **বাহু** (*Arm*), (iii) **মণিবন্ধ** (*Wrist*) এবং (iv) **করতল** (*Hand*) অংশে বিভক্ত। ব্যাঙের করতলে চারটি অঙ্গুলি থাকে। দেহের পশ্চাদ্ভাগের দুইধার হতে একটি ক'রে **পশ্চাৎপদ** (*Hind limb*) বিদ্যমান। অগ্রপদের মতো এটিও চার ভাগে বিভক্ত ; যথা—(i) **জঙ্ঘা** (*Thigh*), (ii) **জানুতল** (*Leg*), (iii) **গোড়ালি** (*Ankle*), এবং (iv) **পদতল** (*Foot*)। পদতলে পাঁচটি অঙ্গুলি (*Phalanges*) থাকে। চতুর্থ অঙ্গুলি সবচেয়ে বড়। অগ্রপদের অঙ্গুলির মধ্যে তৃতীয়টি বড়। ব্যাঙের পশ্চাৎপদ অগ্রপদ অপেক্ষা অনেক বড়। পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিগুলি বেশ কিছুদূর পরস্পরের সঙ্গে পাতলা চামড়া দিয়ে যুক্ত। এই ধরনের পদকে **লিপ্তপদ** (*Webbed foot*) বলা হয়। দুটি পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রটি সামান্য পিঠের দিকে থাকে। একে **অবসারণী ছিদ্র** বা **ক্লোয়াকাল অ্যাপারচার** বলে। পুরুষ-ব্যাঙের অগ্রপদের মাঝের দুই অঙ্গুলির তলদেশে কালো রঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। কুনো-ব্যাঙের দেহের চামড়া শিথিল। এটিও মাছের মতো অনুষ্ণশোণিত জীব। ব্যাঙ কর্ডাটা পর্বের অধীনস্থ উভচর বা অ্যাম্ফিবিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী।

গিরগিটি (Lizard)

গিরগিটি সরীসৃপ শ্রেণীর আদর্শ প্রাণী। ঝোপে-জঙ্গলে বা বাগানে গিরগিটি দেখতে পাওয়া যায়। এর লেজ বেশ লম্বা ও মাথাটি লালচে রঙের। গিরগিটির পিঠের মধ্যরেখার উপর লম্বালম্বিভাবে একসারি কাঁটা দেখা যায়। এইরকমের গিরগিটির বৈজ্ঞানিক নাম *Calotes versicolor*। গিরগিটির সর্বাঙ্গ আঁশে (*Scale*) ভরা। আঁশের উৎপত্তি মাছের মতো চামড়ার অন্তঃত্বক্ থেকে হয় না। চামড়ার বহিঃত্বক্ থেকে এর উৎপত্তি। গিরগিটির দেহ মাথা, গ্রীবা, ধড় ও লেজে বিভক্ত। মাথাটি ছোট ত্রিকোণাকৃতি এবং এটি ধড়ের সঙ্গে ছোট গ্রীবার মাধ্যমে যুক্ত। এর লেজ লম্বায় ধড়ের চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বেশী এবং এই অঙ্গটি প্রথমে দড়ির মতো গোলাকার থাকে ও ক্রমে ক্রমে সরু হতে আরম্ভ ক'রে শেষ হয়। গিরগিটির মুখছিদ্রটি প্রিজম-এর মতো মাথার অগ্রাংশে বিদ্যমান ও ব্যাঙের মতো মুখছিদ্রটি উপরের চোয়াল ও নিচের চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি চোয়ালে একই রকমের দাঁত থাকে। মাথার ঠিক অগ্রাংশে একটু উপরে মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে বহিঃনাসারন্ধ্র থাকে। এদের পেছনে ছোট অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ দেখা যায়। চোখে মোট তিনটি পাতা থাকে। তৃতীয় পাতা বা নিকটিটেটিং মেমব্রেনটি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং চোখের অন্তঃকোণে থাকে। চোখের পেছনে একটি ক'রে ছোট চাপা গর্ত পাতলা চামড়ায় ঢাকা থাকে। এটি গিরগিটির কর্ণপটহ। গিরগিটির পিঠটি উত্তল (*Convex*) এবং অঙ্কীয় দিকটি সমতল। ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে একটি আড়াআড়িভাবে ছিদ্র দেখা যায়; এটি পায়ুছিদ্র। পায়ুছিদ্রটি গিরগিটির অবসারণীর (*Cloaca*) ভেতর বিদ্যমান। গিরগিটির অগ্রপদ-দুটি দেহের তুলনায় খুবই ছোট। প্রতিটি অগ্রপদ পুরোবাহু, বাহু, মণিবন্ধ ও করতল—এই চারটি ভাগে বিভক্ত। আবার প্রতিটি করতলে বাঁকা নখযুক্ত পাঁচটি অঙ্গুলি থাকে। প্রথম অঙ্গুলি সবচেয়ে ছোট; একে পোলাক্স (*Pollux*) বলে। দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ-দুটি পায়ুর দুইপাশে যুক্ত হয়ে থাকে। প্রতিটি পশ্চাৎপদ জঙ্ঘা, জানুতল, গোড়ালি ও পদতলে বিভক্ত।

অগ্রপদের মতো পদতলে বাঁকা-নখ-যুক্ত পাঁচটি অঙ্গুলি থাকে এবং এদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম অঙ্গুলিকে হ্যালাক্স বলে। গিরগিটি কর্ডাটা পর্বের অধীনস্থ রেপটিলিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অনুষ্ণশোণিত প্রাণী।

পক্ষী (Birds)

পায়রা (Pigeon)

পক্ষী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পায়রা 'শান্তির দূত' এবং এই শ্রেণীর আদর্শ উদাহরণ। যে-সমস্ত প্রাণীর ডানা আছে এবং যাদের দেহ ও ডানা পালক দিয়ে সজ্জিত, তাদের পক্ষী-জাতীয় বা এভিস্ শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ; যথা—বাজপাখী, পায়রা, চিল, কোকিল প্রভৃতি। বন্য-পায়রা বা গোলা-পায়রা (*Rock-pigeon*) হতেই কৃত্রিম উপায়ে নানারকম বর্ণবিশিষ্ট পায়রার উৎপত্তি। গোলা-পায়রার বৈজ্ঞানিক নাম কলম্বা লিভিয়া (*Columba livia*)। পায়রার দেহ মসৃণ বোটের মতো এবং এর গ্রীবাটি দেহের অগ্রভাগে উড়বার সময় সোজা হয়ে যায়। এইরকমের দেহ-গঠনের জন্য পায়রা অনায়াসে উড়তে পারে। পায়রার শরীর মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত ; যথা—(i) মস্তক বা মাথা, (ii) গ্রীবা, (iii) ধড়। মাথাটি ছোট ও গোলাকার। এটি দ্রুত সঞ্চরণশীল। মাথার সামনে একজোড়া শক্ত, ত্রিকোণ চঞ্চু বা ঠোঁট বিদ্যমান। মুখগহ্বরটি চঞ্চুর দ্বারা আবদ্ধ। উপর-চঞ্চুর মূলে দুটি বহিঃনাসারন্ধ্র থাকে। এর চারপাশ স্থূল চামড়া দিয়ে আবৃত। একে শিরি (*Cere*) বলা হয়। মাথার দু'পাশে বড় ও গোলাকার দুটি চোখ বিদ্যমান। প্রত্যেকটি চোখের পিছনে একটি ক'রে পালকে-ঢাকা কর্ণছিদ্র (*Auditory aperture*) থাকে। গ্রীবার পেছন থেকে অগ্রপদ-দুটি বের হয়। প্রতিটি অগ্রপদে তিনটি অঙ্গুলি থাকে। অগ্রপদে মোট তেইশটি ডানার পালক (*Remiges*) সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। প্রথম অঙ্গুলিতে (*Pollux*) কিছুসংখ্যক ছোট ছোট পালক সাজানো থাকে। এই পালকগুলিকে বাস্টার্ড পালক বলে।

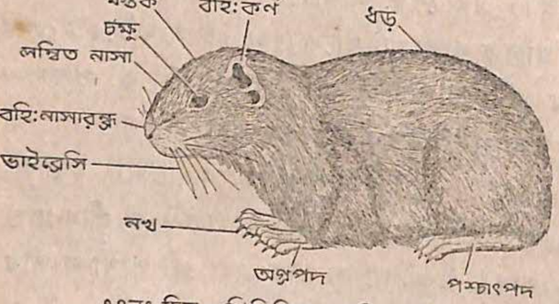
দেহের পশ্চাদ্ভাগ হতে দু'পাশে একটি ক'রে পশ্চাৎপদ থাকে। পশ্চাৎপদের জঙ্ঘাটি ছোট, মজবুত এবং পেশীবহুল। জঙ্ঘা ব্যতীত

পশ্চাৎপদের নিম্নাংশের সর্বত্রই আঁশে ঢাকা থাকে। প্রথম অঙ্গুলি পায়রার বসা-অবস্থায়, লেজের দিকে বা পশ্চাদ্‌মুখী হয়ে থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গুলিগুলি মাথার দিকে বা সম্মুখমুখী হয়ে থাকে। পায়রার ধড়টি গোলাকারে শেষ হয়েছে। এর শেষ অংশটিতে এক-সারিতে লম্বা-লম্বা বিশেষ ধরনের বারোটি পালক সাজানো থাকে এবং এই অংশটিকেই লেজ বলা হয়। এর নাম **ইউরোপাইজিয়ম**। পালকগুলিকে **পুচ্ছপক্ষ** (*Rectrices*) বলে। ইউরোপাইজিয়ম এবং ধড়ের শেষাংশের সংযোগস্থলে অবসারণী-ছিদ্র (*Cloacal aperture*) আড়াআড়িভাবে থাকে। ইউরো-পাইজিয়মের শীর্ষদেশে একটি গ্রন্থি থাকে। একে **তৈলগ্রন্থি** বা **প্রীন গ্লাণ্ড** (*Preen gland*) বলে। পায়রা **উষ্ণশোণিত** জীব এবং এটি পাখী-জাতীয় বা এভিস্‌ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্যারিনেটিডি (*Carinatidae*) উপশ্রেণী বা উড়োপাখী-জাতীয় প্রাণী।

গিনিপিগ (Guineapig)

গিনিপিগ একটি **স্তন্যপায়ী** (*Mammal*) প্রাণী। ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী স্তন্যপায়ী জীবেরাই প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বোচ্চস্তরের প্রাণী রূপে পরিগণিত। মানুষ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীব। গিনিপিগের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাভিয়া পোর্সিলাস (*Cavia porcellus*)। এরা তৃণভোজী এবং এদের সামনের দাঁতগুলি তীক্ষ্ণ হওয়ায় গিনিপিগ-জাতীয় প্রাণীদের **তীক্ষ্ণদন্ত** (*Rodent*) প্রাণী বলা হয়। গিনিপিগের দেহকে চার ভাগে ভাগ করা যায় ; যথা—মাথা, গ্রীবা, ধড় ও পদ। দেহের বহিরাকৃতিতে লেজের কোন অস্তিত্ব নেই। মাথার শীর্ষাগ্র, বহিঃনাসারন্ধ্র, পদতল এবং করতল ব্যতীত এদের দেহের সর্বত্র লোমে আবৃত। সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাথাটি লম্বা এবং এর শীর্ষদেশের মধ্যরেখার তু'পাশে একটি ক'রে বহিঃনাসারন্ধ্র-সমেত নাসিকা আছে। বহিঃনাসারন্ধ্রের তু'পাশে কতকগুলি শক্ত, লম্বা লোম থাকে। এগুলিকে গোঁফ বা ভিব্রেসি (*Vibrassae*) বলা হয়। উপর-চোয়ালের মাঝখানটি কাটা। এই কাটার মধ্যে দিয়ে তুটি লম্বা দাঁত দেখা যায়।

বহিঃনাসারন্ধ্রের পেছনে মাথার দু'পাশে একটি ক'রে চোখ থাকে। চোখের উপরের ও নিচের পাতা দুই-ই সঞ্চালনশীল। এদের তৃতীয় পাতা বা নিকটিটেটিং মেমব্রেনটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে চোখের অন্তঃকোণে থাকে।

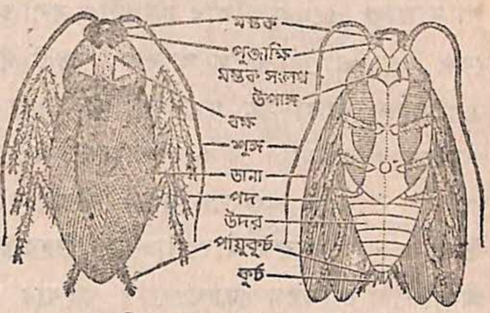


৭৪নং চিত্র—গিনিপিগের বহিরাকৃতি।

চোখের পেছনে একটি ক'রে বহিঃকর্ণ বা পিনা (*Pinna*) থাকে। পিনা সঞ্চালনশীল এবং কর্ণছিদ্রটি পিনার ভেতরে থাকে। ক্ষুদ্র গ্রীবা একদিকে মাথা এবং অন্যদিকে ধড়কে সংযুক্ত ক'রে থাকে। গ্রীবাও সঞ্চালনশীল। ধড়টি দুই ভাগে বিভক্ত। এর অগ্রভাগটি পাঁজরের হাড় এবং উরঃফলকের দ্বারা আবদ্ধ। ধড়ের এই অগ্রভাগকে বক্ষ বলা হয়। ধড়ের পশ্চাদ্ভাগটিকে উদর বলে। উদরের দুই পাশে একটি ক'রে মোট দুটি স্তনবৃন্ত (*Teats*) থাকে। পুং-গিনিপিগে এই দুটি ক্ষয়প্রাপ্ত। উদরের শেষ সীমানায় এবং সামান্য পিঠের দিকে একটি পায়ুছিদ্র (*Anus*) দেখা যায়। পায়ুর সামান্য নিচে ও অঙ্কীয়ের দিকে জনন-ছিদ্র (*Genital opening*) এবং তার সামান্য উপরে মূত্র-নিষ্কাশন-ছিদ্র বা গবিনী-ছিদ্র (*Urinary aperture*) দেখা যায়। পুরুষ-গিনিপিগের পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে চর্ম-আস্তরণের (*Scrotum*) মধ্যে অণ্ডকোষ (*Testes*) থাকে। বুকের দুইপাশে গিনিপিগের অগ্রপদ-দুটি যুক্ত থাকে। এটি পুরোবাহু, বাহু, মণিবন্ধ ও করতলে বিভক্ত। করতলে চারটি নখযুক্ত অঙ্গুলি থাকে। এদের বৃদ্ধাঙ্গুলি নেই। এদের পশ্চাৎপদটি অগ্রপদ অপেক্ষা বড় ও মজবুত। এটি জঙ্ঘা, জানুতল, গোড়ালি এবং পদতলে বিভক্ত। পদতলে তিনটি নখযুক্ত অঙ্গুলি থাকে। গিনিপিগ কর্ডাটা পর্বের অধীনস্থ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তীক্ষ্ণদন্ত বা রোডেনসিয়া বর্গের উষ্ণশোণিত শাকাশী (*Herbivorous*) প্রাণী।

আরশোলা (Cockroach)

আরশোলা অমেরুদণ্ডী সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী। আরশোলার বাস ভাঁড়ারঘরে, রান্নাঘরে, চাল ও ডালের গুদামে এবং অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে জায়গায়। এদের দেহ মেহগনী রঙের বা চকলেট রঙের আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে। আরশোলার দেহকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়; যথা—মাথা, বুক ও উদর। এদের মাথা প্রায় ত্রিকোণ আকারের। মাথার তলায় একেবারে শেষের দিকে মুখছিদ্র থাকে। মাথাটি বুকের সঙ্গে একটি সরু গলা দিয়ে যুক্ত। তাই আরশোলা অতি সহজে তার মাথা এদিক-ওদিক নাড়াতে পারে। মাথার আগায় একটি ক'রে মোট দুটি লম্বা শুঁড় বা শুঙ্গ দেখা যায়। ছোট ছোট খণ্ড পর পর যুক্ত হয়ে এইরকমের শুঁড় তৈরি করে। শুঁড় আরশোলার স্পর্শেন্দ্রিয় বা অনুভূতির কাজ করে। প্রতিটি শুঁড়ে 75 থেকে 90টি গাঁট দেখা যায়। প্রতিটি শুঁড়ের পেছনে একটি ক'রে বড় যৌগ চোখ বা পুঞ্জাক্ষি থাকে। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি অসংখ্য সরল চোখের সমন্বয়ে গঠিত। মুখের উপর-নিচে ঠোঁট থাকে। মুখের দু'পাশের দুটি উপাঙ্গকে চোয়াল বলে। আরশোলার বক্ষ-অঞ্চলটিকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশকে অগ্রবক্ষ বলা হয়। এর উপর একটি ত্রিকোণাকৃতি আবরণী থাকে। দ্বিতীয় অংশ বা মধ্যবক্ষ হতে একজোড়া পুরু ডানা দেখা যায়। তৃতীয় অংশ বা পশ্চাদ্‌বক্ষ হতে একজোড়া খুব পাতলা ডানা থাকে। প্রথম-জোড়া ডানা শক্ত। ওড়ার সময়ে আরশোলা প্রথম-জোড়া ডানা ব্যবহার করে না। দ্বিতীয়-জোড়া ডানা পাতলা ও শিরাযুক্ত। উড়বার সময়ে আরশোলা এই ডানা-দুটি ব্যবহার করে। আরশোলা যখন বসে তখন প্রথম ডানা-দুটি দ্বিতীয় ডানা-দুটিকে ঢেকে রাখে। তাই প্রথম



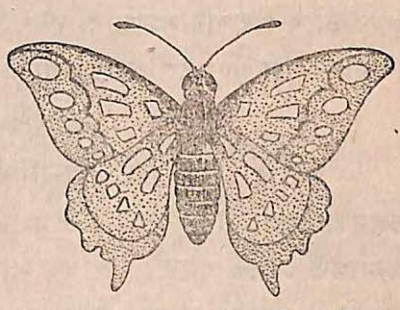
৭৫নং চিত্র—আরশোলার বহিরাকৃতি।

ডানা দুটিকে আবরণ-ডানা বলা হয়। বক্ষের তিনটি অঞ্চল থেকে পর্যায়ক্রমে তিনজোড়া পদ-উপাঙ্গ দেখা যায়। প্রতি পদে পাঁচটি খণ্ড থাকে। খণ্ডগুলি পরস্পর গাঁট দিয়ে যুক্ত থাকে। পায়ে গাঁট বা সন্ধি থাকায়, পতঙ্গকে সন্ধিপদী পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রতিটি পতঙ্গে ছ'টি পা থাকায়, এদের আবার ষট্‌পদীও বলা হয়। প্রতিটি পদের শেষভাগটি বেশ লম্বা ও শেষভাগে আবার পাঁচটি গাঁট থাকে। পায়ের শেষভাগে একজোড়া বাঁকা নখ থাকে। পা দিয়ে আরশোলা চলা-ফেরা করে। আরশোলার মোটা উদর-অঞ্চল দশটি খণ্ডকে বিভক্ত। পুরুষ-আরশোলার অষ্টম ও নবম দেহখণ্ডককে সপ্তম দেহখণ্ডক ঢেকে রাখে। স্ত্রী-আরশোলার উদর-অঞ্চল পুরুষ-আরশোলার উদর-অঞ্চল থেকে স্থূল। পুরুষ-আরশোলার নবম দেহখণ্ডকের দুইধার থেকে একটি ক'রে গাঁটবিহীন উপাঙ্গ দেখা যায়। এই ছোট দুটি উপাঙ্গকে **স্টাইল** বলা হয়। স্ত্রী-আরশোলার স্টাইল থাকে না। স্টাইল দেখেই আরশোলা পুরুষ না স্ত্রী তা চেনা যায়। আবার প্রত্যেকটি আরশোলার দশম দেহখণ্ডকের তলার দিক থেকে দুই-গাঁটযুক্ত উপাঙ্গ থাকে। এগুলি স্টাইলের চেয়ে বড়। এদের বলা হয় অ্যানাল সারকাস। অ্যানাল সারকাসের ঠিক মাঝখানে পায়ু বিদ্যমান। পায়ু থেকে আরশোলার মল, মূত্র ও ডিম বের হয়। আরশোলার দেহের প্রতি পাশে পর্যায়ক্রমে দশটি ক'রে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রগুলি দিয়ে বাইরের বাতাস দেহের ভেতর প্রবেশ করে ব'লে এদের আরশোলার শ্বাসছিদ্র বলে।

প্রজাপতি (Butterfly)

প্রজাপতি অমেরুদণ্ডীর অধীনস্থ সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ-শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এরা নানা রঙের ও আকারের হয়। দুইজোড়া রঙ-বেরঙের বড় ডানা এদের বৈশিষ্ট্য। প্রজাপতির ডানা পাখীর ডানার মতো নয়। পাখীর ডানা পালকে মোড়া, কিন্তু প্রজাপতির ডানা তার চামড়ার এপিডারমিস বা বহিঃত্বক্‌ থেকে উৎপন্ন হয়। ডানা-দুটি একই আকারের এবং লোম বা সূক্ষ্ম আঁশ দিয়ে আবৃত থাকে। এদের দুটি চোখ যৌগিক এবং বেশ বড়। প্রজাপতির দেহ লম্বা ও কৃশ। দেহে রোম বা সূক্ষ্ম

আঁশ দেখা যায়। মাথাটি ছোট এবং এর শীর্ষস্থান থেকে ছুটি গাঁটযুক্ত লম্বা অ্যানটিনা বা শুঁয়া দেখা যায়। অ্যানটিনা শাখাবিহীন ও সোজা সামনের দিকে বিস্তৃত। এদের অগ্রাংশ স্থূল। প্রজাপতির ডানায় শিরা-উপশিরা দেখা যায়। প্রজাপতির ডানার শিরা-উপশিরার তত্ত্ব (*Venation theory*) অনুসারে বিবিধ প্রকারের প্রজাপতিকে সনাক্ত করা হয়। অগ্র-ডানার শিরা-উপশিরা পশ্চাৎ-ডানার শিরা-উপশিরার সঙ্গে মেলে না। প্রজাপতির মুখটি লম্বা নলের মতো। গর্ভপত্রের ভেতরের মধু এরা এই নলের সাহায্যে শোষণ ক'রে নেয়। এটিকে প্রজাপতির প্রোবসিস্ (*Proboscis*) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রোবসিস্—ছুটি অর্ধ-নলের যুক্ত রূপ। অর্ধ-নলের লম্বা ধারগুলি জুড়ে একটি লম্বা গোলাকার প্রোবসিসের রূপ নেয়। ঘড়ির স্প্রিং যেমন গুটানো থাকে, তেমনি প্রজাপতির প্রোবসিস্ও প্রজাপতির মুখের ভেতর গুটানো থাকে। এরা ফুলের উপর বসবার পরে স্প্রিং-এর মতো প্রোবসিস্ সোজা হয়ে ফুলের গর্ভপত্রের ভেতর ঢুকে যায় এবং তরল পানীয় শোষণ ক'রে নেয়। এর ছুটি চোখ যৌগিক। প্রজাপতির তিনজোড়া গাঁটযুক্ত পা দেখা যায়। অগ্রপদ-ছুটি ক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্ষীণ। এটি প্রজাপতির বক্ষে ভাঁজ অবস্থায় থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতির ক্ষেত্রে অগ্রপদ-ছুটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এক-একটি গোলাকার গুটিতে পরিণত হয়। পুরুষ-প্রজাপতির উদরের শীর্ষাগ্রে ব্রাশের মতো রোম দেখা যায়। মিলানিটিস (*Melanitis*), পিয়ারিস্ (*Pieris*), প্যাপিলিও (*Papilio*), হেস্‌পেরিডিও (*Hesperidio*) প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের প্রজাপতি দেখা যায়।



৭৬নং চিত্র—প্রজাপতির বহিরাকৃতি।

পূর্ণাঙ্গ মথ সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি ও তুলনামূলকভাবে প্রজাপতির চেয়ে স্থূল, দেহ প্রচুর আঁশতুল্য রোমে আবৃত, চোখ ছুটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ডানা প্রায়ই একবর্ণ ও শাখাযুক্ত এবং সামান্য বক্র শুঁয়া-ছুটির অগ্রাংশ

স্থূল নয়। পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি সাধারণতঃ দিবাচর, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মথ সাধারণতঃ নিশাচর। বিশ্রামের সময় পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ডানা-দুটি খাড়াভাবে পরস্পর-সংবদ্ধ বা দুইপাশে বিস্তৃত রাখে। পূর্ণাঙ্গ মথের ডানা বিশ্রামকালে পৃষ্ঠদেশে শায়িত থাকে।

শামুক (Snail)

জলের শামুকের বৈজ্ঞানিক নাম *Pila globosa*। শামুকের চলনপ্রক্রিয়া ধীর, কিন্তু চলতে একবার আরম্ভ করলে, বহুক্ষণ ধ'রে ক্রমাগত চলতে পারে। শামুক সাধারণতঃ পুকুরে, ডোবা বা ধানক্ষেতের জলের ভেতর দেখা যায়। এর দেহ একটি কঠিন খোলক-এর ভেতর আবদ্ধ থাকে। খোলকটি প্যাঁচানো। প্যাঁচের প্রথম পাকটি ক্ষুদ্রতম; শেষটি সবচেয়ে বড় এবং গঠন গোলাকার। খোলকের প্যাঁচের প্রক্রিয়া দক্ষিণাবর্ত। খোলকের শেষ পাকের মুখে একটি গোলাকার ঢাকনা বা অপারকুলাম (*Operculum*) থাকে। এটি শক্ত চাকতির মতো। প্রাণী ঢাকনার সাহায্যে সমস্ত দেহটিকে খোলকের ভেতর আবদ্ধ ক'রে রাখে। চলা-ফেরা করার সময়ে প্রাণীটি ঢাকনা খুলে দেয়। তখন দেহের বেশ কিছু অংশ, যথা—মাথা ও পা দেখা যায়। শামুকের একটি মাত্র পা। এর অগ্রভাগ গোলাকার এবং পশ্চাদ্ভাগ তির্যক্। পেছন থেকে বা পেটের দিক থেকে দেখলে এটি ত্রিভুজের মতো দেখায়। শামুকের ঢাকনাটি পায়ের পশ্চাদ্ভাগে আটকে থাকে। পা-টি স্থূল, মাংসল এবং গ্রন্থিকোষ-বহুল। মাথাটি পায়ের অগ্রভাগে থাকে এবং এর তুণ্ডটি (*Snout*) সাধারণতঃ চলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। তুণ্ডটির অগ্রভাগের দুইধারে দুইজোড়া কর্ষিকা (*Tentacles*) থাকে। প্রথম জোড়াটি ছোট এবং এর মাঝে ও সামান্য নিচে শামুকের মুখছিদ্রটি থাকে। কর্ষিকা-গুলির দ্বারা আবৃত থাকায়, সাধারণতঃ মুখছিদ্রটি দেখা যায় না।



৭৭নং চিত্র—শামুকের বহিরাকৃতি।

তাই প্রথম-জোড়া কর্ষিকাকে ওষ্ঠ বলে। দ্বিতীয় কর্ষিকা-দুটি প্রথম কর্ষিকাগুলির পেছনে থাকে এবং এর আকার অনেক বড়। দ্বিতীয় কর্ষিকার ঠিক নিচে একটি ক'রে বৃন্তযুক্ত সরলাক্ষি থাকে। দেহের দক্ষিণে একটি ছিদ্র থাকে। একে জননছিদ্র বলে। জননছিদ্রের পাশেই পায়ুছিদ্র থাকে। দেহের আরও দক্ষিণদিকে শ্বাসছিদ্র থাকে।

স্থলে যে-সব শামুক বাস করে, তাদের মধ্যে অ্যাকাটিনা ফুলিকা (*Achatina fulica*) নামক শামুক প্রায়ই দেখা যায়। শম্বুক বা শামুক মোলাসকা (*Mollusca*) পর্বের অন্তর্ভুক্ত গ্যাস্ট্রোপোডা (*Gastropoda*) শ্রেণীর অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বীজের অঙ্কুরোদ্গম (Germination of Seeds)

অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগী অবস্থা

(Conditions of Germination)

১। জল (*Water*) : জল অঙ্কুরোদ্গমের প্রধান সহায়। কারণ, বীজ সুপ্ত অবস্থায় শুষ্ক থাকে। জল বীজকে নরম করে এবং বীজত্বক্ নরম হওয়ায়, ভ্রূণমুকুলের চাপে সহজেই ফেটে যায়। সস্যের ভেতরকার কঠিন খাদ্যগুলি জলের সাহায্যে তরলে পরিণত হয় এবং ভ্রূণের কোষগুলি জলশোষণে স্ফীত হয়। কোষের প্রোটোপ্লাজমে জলের হার স্বাভাবিক হওয়ায়, এরা যাবতীয় বিপাকীয় কাজ করতে পারে। বীজত্বক্ স্ফীত হওয়ায়, বাতাসের অক্সিজেন কোষের ভেতর প্রবেশ করতে পারে। বীজপত্রে বা সস্যে সঞ্চিত খাদ্য জলে দ্রবীভূত হয় এবং ভ্রূণের কোষগুলি ধীরে ধীরে অভিস্রবণ-প্রণালীর দ্বারা তা শোষণ করে।

২। তাপ (*Temperature*) : যে-কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া কার্যকরী করতে হলে, তাপের প্রয়োজন অপরিহার্য। তাপই রাসায়নিক সংকেতের সূচনা করে। কঠিন সঞ্চিত খাদ্যগুলি জলের উষ্ণতার সাহয্যেই দ্রবীভূত হয়। শুধু তাই নয়, কোষের প্রোটোপ্লাজম তাপ শোষণ না করতে পারলে, কোষ সাধারণ বিপাকীয় কাজগুলি করতে

পারে না। আবার তাপের মাত্রা বেশী হলে, অঙ্কুরোদ্গম দ্রুত হয় এবং তাপের মাত্রা কম হলে, অঙ্কুরোদ্গম অতি ধীরে ধীরে হয়। সাধারণতঃ 5°C তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হয়। 45°C হতে 48°C তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম খুব বেশী মাত্রায় হয়। 45°C হতে 30°C তাপে সাধারণ অঙ্কুরোদ্গম হয়ে থাকে।

৩। বাতাস (*Air*)ঃ বাতাসের বিবিধ গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন জীবের প্রাণ-স্বরূপ। এটি জীব-জাগরণ প্রক্রিয়ায় শ্বসন-কাজের জন্য দরকার হয়। সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য হতে শক্তি নির্গত করতে হলে, সেটিকে দহন করার প্রয়োজন। কোষের মধ্যে খাদ্যরসকে অক্সিজেনই কেবল দহন করতে পারে। সুতরাং শক্তি-বিকাশের জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক। শক্তি না পেলে ভ্রূণের কোষগুলির বৃদ্ধি হয় না এবং ভ্রূণ-জাগরণেও বাধা সৃষ্টি হয়। মাটির গভীরে বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। বীজ অক্সিজেন শোষণ করতে না পারলে, সেটি পরে নষ্ট হয়ে যায়।

বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পরের পর্যায়ে আলোর দরকার হয়। আলো বীজপত্র বা প্রথম পাতায় সালোকসংশ্লেষের ক্রিয়া কার্যকরী করে।

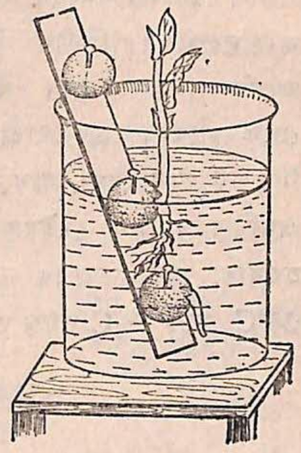
বীজের অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা

জল, বাতাস ও তাপ বীজের অঙ্কুরোদ্গম-পদ্ধতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এরূপ পরীক্ষাকে তিনটি মটরের সাহায্যে পরীক্ষা (*Three Bean Experiment*) বলা হয়। নিচে পরীক্ষাটির বর্ণনা করা হ'ল—

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (*Materials for experiment*)ঃ একটি বড় বীকার, কিছু মোম, একটি 3" চওড়া এবং 5" লম্বা কাঠের টুকরো এবং কিছু মটর-বীজ।

পরীক্ষা (*Experiment*)ঃ একটি বড় বীকার টেবিলের উপর রাখো। কাঠের টুকরোটিকে গালানো মোমে ডুবিয়ে রাখো। মোম ঠাণ্ডা হলে, কাঠের টুকরোটির দু'পাশে জমা হতে দেখা যাবে। এখন টুকরোটির সামনের দিকে, পিছনদিকে এবং মাঝখানে যথাক্রমে তিনটি শুকনো মটর-বীজ আলপিন দিয়ে আটকে দাও। কাঠের টুকরোটিকে এখন

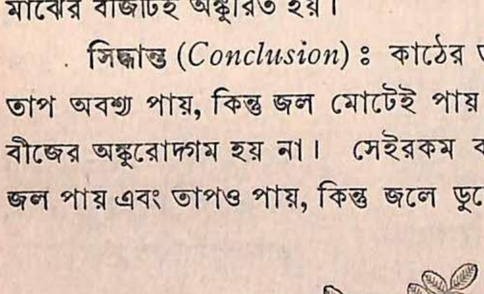
বীকারের ভেতর হেলানোভাবে লম্বালম্বি রাখো। এখন অন্য একটি বীকারে কিছু জল গরম করো। জল গরম হলে, তার দ্রবীভূত অক্সিজেন দূর হয়ে যায়। এখন এই গরম জলকে ঠাণ্ডা ক'রে বীকারের ভেতর এমনভাবে ঢালো যাতে মাঝখানের বীজের মাঝামাঝি জল-রেখা স্থিতিলাভ করে, অর্থাৎ মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের ভেতর থাকে। এখন বীকারটিকে এইভাবে দিন-দুই টেবিলের ওপর রাখো।



৭৮নং চিত্র—অঙ্কুরোদ্গমের পরীক্ষা।

নিরীক্ষা (*Observation*) ঃ দিন-দুই পরে দেখা যাবে যে, কাঠের পিছনদিকে বীজটি অঙ্কুরিত হয় না। এমনকি কাঠের ডগার বীজটিও অঙ্কুরিত হয় না এবং কেবল মাঝের বীজটিই অঙ্কুরিত হয়।

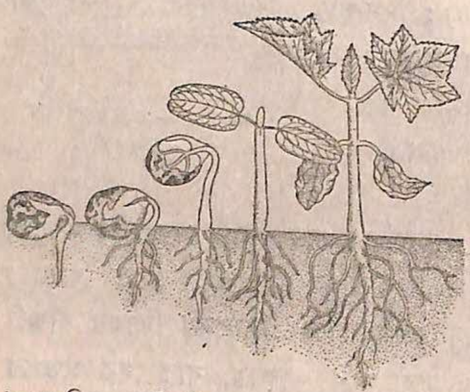
সিদ্ধান্ত (*Conclusion*) ঃ কাঠের ডগার বীজটি বাতাস ও সাধারণ তাপ অবশ্য পায়, কিন্তু জল মোটেই পায় না। সুতরাং জলের অভাবে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সেইরকম কাঠের পিছনের দিকের বীজটি জল পায় এবং তাপও পায়, কিন্তু জলে ডুবে থাকায়, বাতাসের অভাবে বীজটির অঙ্কুরোদ্গম হয় না। মাঝের বীজটি জল, বাতাস এবং তাপ সবই পায়। সেইজন্য এই বীজটি স্বাভাবিকভাবে অঙ্কুরিত হয়।



৭৯নং চিত্র—ছোলা-বীজের মৃদ্‌বর্তী অঙ্কুরোদ্গম।

এখন উপরের পরীক্ষাটি দুটি বীকারে আলাদাভাবে আরম্ভ করো। প্রথম বীকারে গরম জল এমন-

ভাবে ঢালো, যাতে মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের ভেতর থাকে। জলের উত্তাপ যেন সব সময়ের জন্য 50°C-এর চেয়েও বেশী থাকে, তার ব্যবস্থা করা দরকার। দ্বিতীয় বীকারের ভেতর বরফজল ঠিক মাঝের বীজের অর্ধেক পর্যন্ত ঢালো। বীকারের চারপাশে কঠিন বরফ গুঁড়ো ক'রে ঢেকে রাখো। এর দ্বারা বীকারের জলের তাপ সর্বদাই কম থাকে। দিন-দুই পরে দেখা যায় যে, প্রথম বীকারে বেশী গরমের জন্য বীজ অঙ্কুরিত হয়নি। সেইরকম দ্বিতীয় বীকারের জলের তাপ অত্যধিক কম হওয়ায়, তার ভেতরের মাঝের বীজটিও অঙ্কুরিত হয়নি। সুতরাং শুধু 25°C থেকে 48°C পর্যন্ত তাপ অর্থাৎ সাধারণ উত্তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় এবং 50°C-এর অধিক এবং 5°C-এর চেয়ে কম উত্তাপে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয় না। সুতরাং তিনটি বীকারের মটর-বীজ নিয়ে যে পরীক্ষা করা হ'ল, তাতে তাপের নানান মাত্রা বীজের অঙ্কুরোদ্গম-প্রণালী কি-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাই প্রমাণিত হ'ল।



৮০নং চিত্র—রেড়ি-বীজের মৃদ্ভেদী অঙ্কুরোদ্গম।

অঙ্কুরোদ্গমের প্রকার-ভেদ

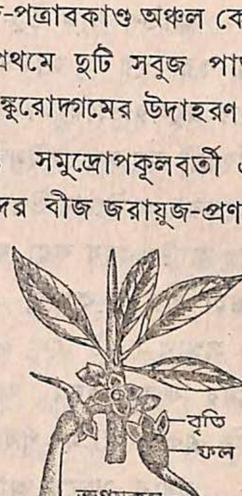
(Types of germination)

বীজের অঙ্কুরোদ্গম তিন রকমের ; যথা—

(১) মৃদ্বর্তী ঃ আগেই বলা হয়েছে, একবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যেই থাকে এবং কখনও মাটির উপর বের হয়ে আসে না। কারণ, বীজের ভ্রূণাক্ষের বীজপত্রাধিকাণ্ড কেবল বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের বীজের অঙ্কুরোদ্গমকে মৃদ্বর্তী অঙ্কুরোদ্গম বলা হয় ; মটর, ছোলা, ধান, গম ও ভুট্টা বীজের অঙ্কুরোদ্গম মৃদ্বর্তীর উদাহরণ।

(২) মৃদ্‌ভেদী : দ্বিবীজ-পত্রী উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে বীজপত্র বীজত্বকের ভেতর থাকে না এবং এটি বীজত্বক্ ভেদ ক'রে মাটির উপর উঠে আসে। এইরকমের অঙ্কুরোদ্গমে ভ্রূণাক্ষের বীজ-পত্রাবকাণ্ড অঞ্চল কেবল বৃদ্ধিলাভ করে। বীজপত্রগুলি মাটির উপর প্রথমে দুটি সবুজ পাতায় পরিণত হয়। কুমড়া, লাউ, রেড়ি ও শিম এই অঙ্কুরোদ্গমের উদাহরণ।

(৩) জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম (*Vivipary*) : সমুদ্রোপকূলবর্তী এবং লবণাক্ত মাটিতে কতকগুলি বিশেষপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জরায়ুজ-প্রণালী অনুসারে অঙ্কুরোদ্গম করে। ফলের ভেতরে থাকা অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। ফলটি তখনও মূল উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে। মূল উদ্ভিদ্ বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাবার যোগায়। বীজ থেকে প্রথমে ভ্রূণমুকুলটি বের হয় এবং নিচের দিকে নেমে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। মাটিতে প্রবেশ করার পরে মূল থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়ে মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে; ফলে, একটি নতুন চারা গাছে পরিণত হয়। সুঁদরি, বীণা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ এর উদাহরণ।



৮১নং চিত্র—সুঁদরির জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থকরী উদ্ভিদ্ ও প্রাণী

(Economic Plants and Animals)

(ক) *অর্থকরী উদ্ভিদ্* (Economic Plants)

১। খাদ্যশস্য (Cereals)

(ক) ধান (*Paddy*) : খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান প্রধান। ধান হতে চাল হয় এবং চাল-ই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। প্রচুর বৃষ্টি, উষ্ণতা ও পলিমাটি-যুক্ত মাটিতে ধান জন্মায়। ধান গাছ তিন

মাসের ফসল। আউশ, আমন ও বোরো এই তিনরকমের ধান প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে চাষ করা হয়।

আউশ ধান উঁচু জায়গায় কিংবা নদীর তীরে বালিময় মাটিতে চাষ করা হয়। আমন ও বোরো ধানের চেয়ে আউশ ধানের চাষের সময়ে জলের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয়। যে-সব জায়গায় বর্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সেইসব জায়গায় আউশ চাষ বেশী হয় এবং সেখানকার লোকেরা আউশের উপর জীবনধারণ ক'রে থাকে। একই জমিতে বারে বারে আউশ চাষ করা যায় না। আউশ ধানগাছ কাঁচা অবস্থায় কেটে নেওয়া হয়। কারণ, এই ধান পেকে গেলে ঝরে যায়। আউশ ধানের খড় লম্বায় ছোট এবং স্বভাবে ভঙ্গুর। প্রতি একরে 12—25 মণ আউশ ধানের ফলন হয়। আজকাল রাসায়নিক সার প্রয়োগে এর ফলন প্রতি একরে 40 মণ পর্যন্ত হতে দেখা যায়।

বর্ষার সময়ে **আমন ধান** চাষ করা হয়। প্রথমতঃ গতবছরের আমন ধান কাটার পরে মাঠে ভালো ক'রে লাঙল দিতে হয়। বর্ষাকাল আরম্ভ হওয়ার পরে বীজ বপন করতে হয়। আলাদা ক'রে 'বীজক্ষেত্রে' বীজ বপন ক'রে চারা ধানগাছ তৈরি ক'রে নিয়ে, পরে সেই চারা গাছ তুলে, লাইন ক'রে জলে-ভরা মাঠে রোপণ করা হয়। 40 থেকে 50 মণ পর্যন্ত আমন ধান প্রতি একরে জন্মায়।

বোরো ধান আউশ বা আমন ধানের মতো ব্যাপকভাবে চাষ হয় না। বোরো বছরে দু'বার চাষ হয়। শীতকালের এবং বর্ষাকালের ধানকে যথাক্রমে খারিফ বোরো ও রবি বোরো বলা হয়। আই.আর.এল.-জাতীয় ধান-বীজ খুব কম সময়ে ফলন দেয়।

চাল পচিয়ে মদ তৈরি করা হয়। ধানের খোসা বরফ-কলে বরফ ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **গম** (*Wheat*) : শুষ্ক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে গমের চাষ ভালো হয়। বার্ষিক প্রায় 23 সেন্টিমিটার পরিমাণ এবং চাষের সময়ে অন্ততঃ 90 দিন বৃষ্টির প্রয়োজন। উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু গম-চাষের উপযোগী নয়। চাষের জন্য ভারী দো-আঁশ মাটি সবচেয়ে ভালো।

জমিতে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকার প্রয়োজন। ভারতে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ গমের বীজ বপন করা হয়। সবুজ সার ব্যতীত অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার-ফসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে 115 কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট ও 138 কিলোগ্রাম সুপার-ফসফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। জমিতে সঞ্চিত জল কম থাকলে, বীজ-বপনের প্রায় 40 দিন পরে, কিন্তু 60 থেকে 100 দিনের মধ্যে এবং গম দানা বাঁধবার সময়ে—অন্ততঃ এই তিনবার জমিতে জলসেচের প্রয়োজন। স্বভাবে দুই রকমের গম দেখা যায়; যথা—শক্ত গম ও নরম গম। শক্ত গম থেকে আটা হয় এবং নরম গম থেকে ময়দা হয়। পশ্চিমবাংলায় ইদানীং গমের চাষ অনেক বেড়ে গিয়েছে। প্রায় ধানের সমতুল্য গমের চাষ হচ্ছে। গম থেকেও মদ তৈরি হয়। সুজি গম থেকে পাওয়া যায়। 100 গ্রাম গমের খাদ্যমূল্য প্রায় 360 কিলো-ক্যালরি, 100 গ্রাম রুটির খাদ্যমূল্য 260 কিলো-ক্যালরি, কিন্তু 100 গ্রাম ভাতের খাদ্যমূল্য মাত্র 120 কিলো-ক্যালরি।

২। রবিশস্য (Pulses)

ছোলা, মটর, মুগ, মসুর, খেসারি, অড়হর ও মাষকলাই—এই ছয় প্রকারের ডাল আমরা প্রধান রবিশস্য রূপে ব্যবহার করি। ডাল-জাতীয় সব উদ্ভিদ্ই শিম্ব গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এদের মূলে অর্বুদের সাহায্যে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পায়। তাই জমি উর্বর করতে হলে, শিম্ব গোত্রের বা ডাল-জাতীয় উদ্ভিদ্ চাষের দরকার। নিচে প্রতিটি ডালের বিবরণ দেওয়া হ'ল; যথা—(ক) ছোলা (*Gram*): ছোলা উদ্ভিদ্ একটি বিরুৎ। ধান ও পাট তোলার পরে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ছোলার চাষ হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ছোলা গাছের ফলগুলি কাঁচা অবস্থায় তুলে ফেলতে হয়। ছোলার ডাল শরীরের পক্ষে উপকারী। এতে প্রচুর উদ্ভিদ্-শর্করা, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন থাকে। (খ) মটর (*Pea*): ছোট বা পায়রা-মটর মাঠের ফসল এবং কাবুলী মটর বাগানের ফসল।

বড় মটরের ফুল সাদা এবং বীজ গোল, সাদা, সবুজ বা হরিদ্রাভ রঙের। ছোট মটরের ফুল নীলাভ বা বেগুনী, বীজ ছোট মার্বেলের মতো ও দেখতে ধূসর রঙের। সবুজ অবস্থায় দানা পুষ্ট হলে, ফলটি মটরশুঁটি বা কড়াইশুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মটরে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও শর্করা-জাতীয় খাদ্য থাকে। (গ) মসুর (*Lentil*) : এটিও ছোলা ও মটরের মতো বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ও বিরুৎ-জাতীয়। ভারতের সর্বত্র, যথা—পশ্চিম-বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, এমনকি 3,500 মিটার উঁচু লদাখেও এর চাষ হয়। বাজারে বড় দানার জাতকে মসুর ও ছোট দানার জাতকে মসুরি বলা হয়। মসুর ডালে শর্করা, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন থাকে। (ঘ) মুগ (*Mung*): সবুজ-খোসা-যুক্ত কলাইকে মুগ-কলাই এবং এর মধ্যে যে জাতের খোসার রঙ সোনালী সবুজ, সেটিকে সোনামুগ কলাই বলা হয়। স্বাদের শ্রেষ্ঠতার জন্য সোনামুগ সবচেয়ে মূল্যবান ডাল। মুগ উদ্ভিদ্ দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ পেকে যায়। ফসল কেটে এক সপ্তাহ রোদে শুকোনোর পরে মাড়াই করা হয়। মুগে শর্করা, স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন থাকে। (ঙ) অড়হর (*Pigeon pea*) : চুনের অভাব নেই, এমন সবরকমের জমিতে অড়হর চাষ করা যায়। এর প্রথম জাতকে জলসী বলে ও ছয় মাসে পাকে। দ্বিতীয় জাতকে নাবী বলে এবং সাড়ে আট মাসে পাকে। (চ) খেসারি (*Chick pea*) : নিচু জমিতে ও এঁটেল মাটিতে এর চাষ অনায়াসে হয়। আমন ধান চাষের পরে জমিতে খেসারির চাষ হয়। খেসারি ডাল বহুদিন খেলে ল্যাথিরিজম নামে নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত রোগ হয় ব'লে আগে মনে করা হ'ত। এখন জানা গেছে যে, ভিসিয়া নামক আগাছা উদ্ভিদ্ খেসারির সঙ্গে জন্মায় এবং তার বিষাক্ত উপক্ষারই পক্ষাঘাত রোগের কারণ। (ছ) কলাই (*Kelai*) : কলাই প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়। একে মাষকলাইও বলে। এর খোসার রঙ সাধারণতঃ কালো, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সবুজাভ কালো হয়। কলাইয়ের ডাল উপাদেয়, সহজপাচ্য, প্রোটিন, খনিজ ও ভিটামিন-প্রধান খাদ্য। ডাল থেকে বড়ি ও পাঁপড় তৈরি হয়।

৩। পাট (Jute)

পশ্চিমবঙ্গে পাটকে সোনার সম্মান দেওয়া হয়। অবিভক্ত বঙ্গদেশ পৃথিবীর পাটের চাহিদার 90% অংশ যোগান দিত। পাটের জন্য প্রচুর জল, সূর্যের প্রখর তাপ এবং বালিমাটির প্রয়োজন। পাট বিরুৎ-জাতীয় উদ্ভিদ্। এটি লম্বায় 5—15 ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এর কাণ্ডটি সোজা, সরু ও নরম। ফলগুলি ক্যাপসুল-জাতীয়।

পাটের চাহিদা প্রচুর। চাল, গম, সিমেণ্ট প্রভৃতি প্রতিটি জিনিস বহন করার জন্য পাটের থলির প্রয়োজন। এ ছাড়া, ভালো জাতের পাটের সাহায্যে কাপড় তৈরি হয়। শাড়ী, রঙীন ছিট, প্যাণ্টের কাপড়ও পাট দিয়ে তৈরি হয়। রবার-শিল্পের মধ্যে পাটেরও অংশ থাকে। কাণ্ডের বাকী অংশকে পাঁকাটি বলা হয়। পাঁকাটি থেকে লেখার কাগজ তৈরি হচ্ছে। পাঁকাটি জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার দুই উপকূলে বহু পাটকল আছে। পাট বহু লোকের জীবিকার্জনের উপায়।

৪। তূলা (Cotton)

তূলা দুই রকমের—কার্পাস তূলা ও শিমুল তূলা। কার্পাস তূলা শিমুলের চেয়ে মোটা। শিমুলের রোঁয়াগুলি সরু ও নরম। তূলা উদ্ভিদ্, কোন ঋতুর গাছ নয়। সাধারণতঃ এদের আকার ছোট লেবু-গাছ বা জবাগাছের মতো হওয়া উচিত। কিন্তু শিমুলের আকার বড় আমগাছের মতো হতেও দেখা যায়। গাছটি দশ-বারো ফুট উঁচু হওয়ার পরে জবাফুলের মতো লালচে বা হলদে রঙের ফুল ধারণ করে। বয়ন-শিল্পে তূলার চাহিদা প্রচুর। আগে শুধু তূলার সুতো দিয়ে কাপড়, ছিট ইত্যাদি তৈরি হ'ত। এখন নিকৃষ্টতর তূলার সঙ্গে অন্যান্য উদ্ভিদের ছাল মিশিয়ে নানারকমের কাপড় তৈরি হচ্ছে। মোটর, সাইকেল প্রভৃতি গাড়ির চাকা বা টায়ারে আঁশ-তূলার প্রয়োজন। ভালো তূলা বাদ দিয়ে, মোটা ছাঁটগুলি রবারের সঙ্গে মিশিয়ে টায়ার তৈরি করা হয়। তূলা একটি বিশুদ্ধ সেলুলোজ-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। বালিশ, তোশক, কুশন, বসবার গদি ইত্যাদিতে তূলার দরকার। তূলা গাছের কাণ্ড থেকে কাগজ তৈরি হয়। তূলার মূল থেকে নানারকমের ঔষধ তৈরি হয়। তূলা-বীজ হতে যে তেল বের হয়, তাও বিশেষ উপকারী।

তূলার তেল সাবান-তৈরিতে লাগে। তূলা-খইলের মণ্ড পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উদ্ভিদের সার হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

৫। শাল কাঠ বা শাল উদ্ভিদ্ (Sal)

শাল উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম সোরিয়া রোবাস্টা (*Shorea robusta*)। এটি একটি বিরাট পর্ণমোচী গাছ। সাধারণতঃ উত্তর ভারতে এর জন্ম। উড়িষ্যা, উত্তর আসাম, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বিহারে শালের বন প্রচুর। শালকাঠ খুব ভারী, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। কাঠের রঙ ধূসর। রেল-লাইনের স্লিপার, ইলেকট্রিকের ও টেলিগ্রাফের খুঁটি হিসেবেও এর ব্যবহার প্রচুর। বসতবাড়ি, সরকারী অফিস ও বিদ্যালয়ের ঘরে জানলা ও দরজার ফ্রেম শালকাঠ দিয়ে তৈরি হয়। আসাম ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে অনেক কাঠের বাড়ি বসতবাড়ি রূপে তৈরি করা হয়। শাল-কাঠ দিয়েই বাড়িগুলি তৈরি হয়। রাস্তার ধারে ধারে কাঠের দোকান-গুলিও শালকাঠ দিয়ে তৈরি। শাল অর্থকরী ও উপকারী উদ্ভিদ্।

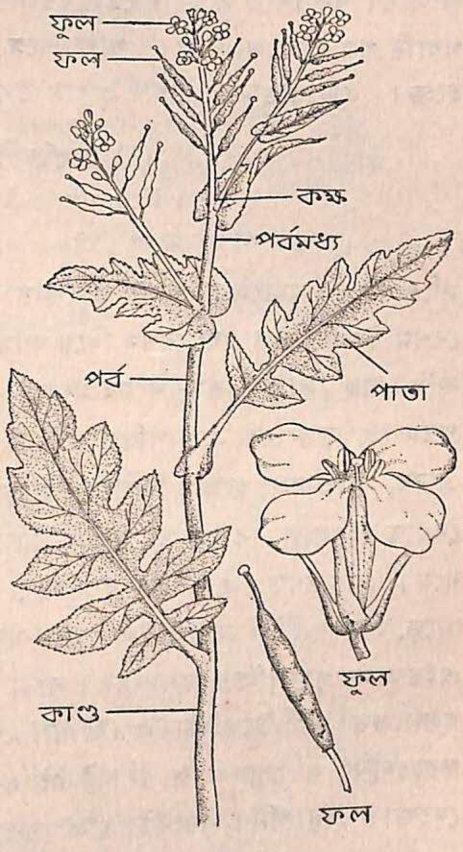
৬। নারিকেল (Cocoanut)

নারিকেল উদ্ভিদ্ আর একটি উপকারী ও অর্থকরী চাষ। সমস্ত দক্ষিণ ভারতে এর চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রের ধারেও প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়, বিশেষতঃ ক্যানিং ও ডায়মণ্ড হারবারের দিকে সারি সারি নারিকেল গাছ দেখা যায়। নারিকেল গাছে একবার ফল ধরলেই প্রতিবছরে ফলন দেয়। নারিকেল গাছের প্রতিটি অংশই আমাদের উপকারে আসে। নারিকেলের গুঁড়ি গ্রামাঞ্চলের খাল-বিল পার হওয়ার সেতু। নারিকেল-পাতা দিয়ে মাদুর বোনা হয়। নারিকেল ফলের উপ-কারিতার তুলনা নেই। কচি ডাব রুগীর পথ্য। নারিকেলের খাদ্য-সামগ্রী ও তার শাঁস সুস্বাদু ও উপকারী। শুকনো



নারিকেল গাছ
৮২নং চিত্র

নারিকেলের শাঁস থেকে নারিকেলের তেল তৈরি হয়। এজন্য বড় বড় কারখানাও চালু আছে। নারিকেল-পাতার কাঠি দিয়ে ঝাঁটা তৈরি হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে অনেক অঞ্চলেই নারিকেল-তেলে রান্না করা হয়। কেশ-পরিষ্কারক ও কেশ-পুষ্টিকারক হিসেবে নারিকেল-তেল সারা ভারতে ব্যবহৃত হয়। দামী গায়ে-মাখা সাবান নারিকেল-তেল হতে তৈরি হয়। নারিকেলের শাঁস থেকে তেল তৈরি করার পরে অবশিষ্ট অকেজো উদ্ভিদ্‌সার-পদার্থ গোরু ও মহিষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে প্রধানতঃ দড়ি তৈরি হয়। দড়ি-তৈরির কারখানাগুলি নারিকেল-তেলের কারখানাগুলির মতো নারিকেলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। নারিকেলের ছোবড়ায় বসবার এবং শোবার খাটের গদি তৈরি হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, নারিকেল গৃহস্থদের একটি অতি প্রয়োজনীয়, উপকারী ও অর্থকরী উদ্ভিদ্।



৮৩নং চিত্র—সরিষার বিবিধ অঞ্চল।

৭। সরিষা (Mustard)

সরিষা উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ব্রাসিকা (*Brasica*)। সরিষা-বীজ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মাঠে ছড়িয়ে বপন করা হয়। মার্চ-এপ্রিলে সরিষার ফল-পাকা আরম্ভ হয়। পুষ্ট ও সবুজ ফল গাছ থেকে তুলে নেওয়া হয়। সরিষাতে 30%—40% তেল থাকে। সরিষা পিষে তেল বের করা

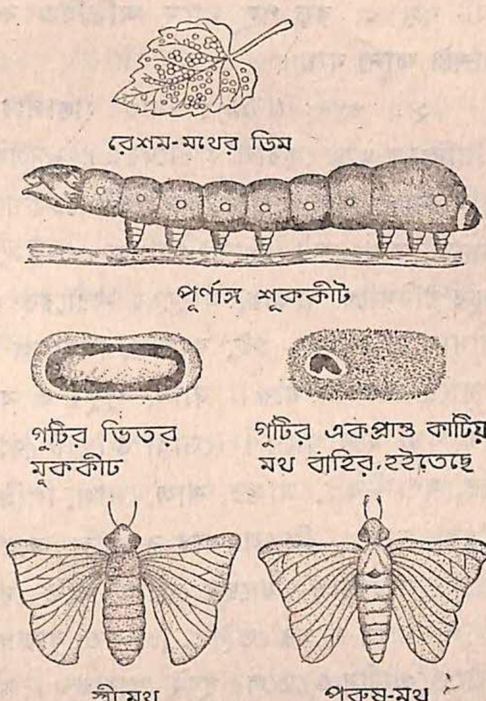
হয়। পশ্চিম-বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও বিহারের লোকেরা রান্না করে প্রধানতঃ সরিষার তেলে। গ্রামের লোকেরা প্রদীপে সরিষার তেল জ্বালায়। বহু শিল্পে সরিষার তেল দরকার। সরিষার খোল চাষের সার ও গবাদি পশুর ভালো খাদ্য। পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্থানে এখন সরিষার চাষ হচ্ছে। এটি বাঙালীর রান্নার প্রধান উপকরণ।

(খ) অর্থকরী প্রাণী
(Economic Animals)

১। রেশম-মথ (*Silk-moth*)ঃ প্রজাপতির মতো রেশম-মথও মানব-সমাজের প্রভূত উপকার করে। রেশম-মথ নানারকমের রেশম উৎপন্ন করে এবং রেশম দিয়ে আমরা ভালো ভালো কাপড় তৈরি করি। বহু লোক রেশম-শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। রেশম-মথ পতঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত এবং প্রজাপতির অতি নিকট আত্মীয়। প্রজাপতির বিষয়ে এদের কথাও বলা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এরা স্বভাবে নিশাচর ও দেখতে অনুজ্জ্বল। বসার সময়ে এরা ডানা-দুটো দেহের দু'পাশে ছড়িয়ে বসে। সাধারণতঃ এরা দুই রকমের ; যথা—যারা বছরে একবার ডিম পাড়ে, তাদের **ইউনিভোল্টাইন** রেশম-মথ বলা হয়। বোমব্যাক্স মোরি এইরকমের গৃহপালিত রেশম-মথ। যারা বছরে বহুবার ডিম পাড়ে,তাদের বলা হয় **মাল্টিভোল্টাইন** (*Multivoltine*) রেশম-মথ। বোমব্যাক্স ফরচুনেট্‌স ও বোমব্যাক্স নিস্‌ট্রি এই ধরনের রেশম-মথ। রেশম-মথের দেহজাত রাসায়নিক পদার্থই হ'ল রেশম। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় এর চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে রেশম-মথের চাষ হয় এবং রেশমের উৎকর্ষতা-বৃদ্ধির জন্য গবেষণাও করা হয়।

সাধারণতঃ তুঁত গাছের পাতা এবং এরণ্ড, পেয়ারা, মুরগা, পলাশ ও কুল গাছের পাতার উপর স্ত্রী-রেশম-মথ ডিম পাড়ে। পূর্ণাঙ্গ রেশম-মথের দেহ সুপুষ্ট এবং উদর অঞ্চল বেশ স্থূল। রেশম-মথ গুটি থেকে বের হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে প্রজনন-কার্যে রত হয়। পুরুষ-মথ প্রজননের পরে মরে যায়। স্ত্রী-মথ এরপর পাতার উপর ঘুরে ঘুরে ডিম পাড়ে।

ডিম পাড়ার পরে স্ত্রী-মথ ম'রে যায়। সাত বা আট দিন পরে ডিম ফুটে শূককীট বের হয়। শূককীট বা রেশমের পলু জন্মাবার পরই পাতা খেতে আরম্ভ করে ও দেহের আকার বৃদ্ধি পায়। শূককীট এক মাস ধ'রে পাতা খাওয়ার পরে দেহের খোলস চারবার ত্যাগ ক'রে শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই সময়ে এদের দেহের রেশম-গ্রন্থি (*Silk-gland*) থেকে রস নিঃসৃত হয়ে মুখের চারপাশে জমা হয়, তখন শূককীট ধীরে ধীরে নিজের চারপাশে ঘুরতে থাকে। রেশম-গ্রন্থির রস বায়ুর সংস্পর্শে আসামাত্রই শক্ত হয়ে রেশম-সুতোয় পরিণত হয়। এই শূককীট নিজের চারপাশে গুটি তৈরি করে এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটির মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখে। এই গুটিগুলিতে প্রায় চারশত গজ রেশম-সুতো থাকে। গুটির মধ্যে শূককীট ধীরে ধীরে পিউপা বা মূককীটে রূপান্তরিত হয়। মূককীট গুটির মধ্যেই মথে রূপান্তরিত হয় এবং গুটির একপ্রান্ত ফুটো ক'রে বের হয়ে আসে। ডিম-অবস্থা থেকে রেশম-মথের অবস্থা পর্যন্ত আসতে সময় লাগে পঁয়তাল্লিশ দিন। রেশম-চাষ-কেন্দ্রে গুটি-তৈরি শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে সমস্ত গুটিগুলিকে গরম জলে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এতে গুটির ভেতরে-থাকা মূককীট বা পিউপা মরে যায় এবং রেশম-সুতোগুলি জলে ভিজে ফুলে ওঠে। তখন সুতো খুলতে



৮৪নং চিত্র—রেশম-মথের জীবন-বৃত্তান্ত।

সুবিধে হয়। রেশম-চাষীরা নানারকমের শূককীটগুলিকে দেশী পলু, ছোট পলু বা বড় পলু নামে অভিহিত করে এবং এইভাবেই এদের বৈশিষ্ট্য জানা যায়।

২। মাছ (*Fish*): মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভাত-মাছ প্রতিদিনের খাদ্য কেরালাবাসীদেরও। সমুদ্রধারের রাজ্য, যথা—উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রভৃতি অঞ্চলেও মাছের চাহিদা প্রচুর। অসমীয়ারাও মাছ-ভাতের ভক্ত। এতে প্রাণিজ প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, তেল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে থাকায়, মানুষের শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পারে। পোনামাছ, যেমন—রুই, কাতলা, মিরগেল ও বাটা সবসময়ে মাছের বাজারে পাওয়া যায়। দীঘি, পুকুর ও বড় খাল বা বিলেও এদের চাষ করা হয়ে থাকে। ডোবা ও ছোট ছোট পাঁক-ভরা পুকুরে জিওল মাছ, যথা—কই, মাগুর, শাল, শোল, শিঙ্গি, বেলে, বান প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। জিওল মাছ রক্তবৃদ্ধি করে এবং ছেলে-মেয়েদের শক্ত রোগের পরে জিওল মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়। এ-ছাড়া গঙ্গার ইলিশ, নোনা-জলের ভেট্‌কি, চিতলও বাজারে পাওয়া যায়। মানুষের শরীরে প্রোটিন ও তেলের খুবই প্রয়োজন। মাছ ব্যতীত প্রাণিজ প্রোটিন মুরগী ও ছাগলের মাংসতেও পাওয়া যায়। কিন্তু মাছ এখনও অন্যান্য প্রাণিজ প্রোটিন-খাদ্যের চেয়ে সস্তা। মৌরলা, খলসে, বাঁশপাতা মাছ, খয়রা প্রভৃতি নানারকমের কম দামের মাছেও প্রচুর প্রোটিন থাকে। এ-ছাড়া সমুদ্রের মাছও আছে। ডায়মণ্ড হারবার, দীঘা প্রভৃতি সমুদ্রোপকূল থেকে সমুদ্রের মাছ বাজারে প্রতিদিন কম-বেশী আসে। সব মাছের দেহেই প্রোটিনের অংশ থাকে।

মাছ শুধু যে কাঁচা অবস্থায় পাওয়া যায় তা নয়, শুকনো মাছও বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। শীতকালে সমুদ্র থেকে প্রচুর মাছ ধরা হয়। বরফের অভাবে মাছ নষ্ট হয়ে যায়, তাই মাছ রোদে শুকিয়ে রাখা হয়। এগুলিকে ‘শুঁটকী মাছ’ বলে। পশ্চিমবাংলায় প্রায় সর্বত্র শুঁটকী মাছের চাহিদা আছে। এতেও প্রোটিন থাকে। দীঘায় ও জোনপুটে প্রচুর শুঁটকী মাছের উৎপাদন হয়। উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি

জায়গায় শুঁটকী মাছই প্রধান খাদ্য। মাছ শুকিয়ে গুঁড়ো ক'রে রাখার জন্য মেদিনীপুরের জোনপুটে সরকারী কারখানা আছে। মাছের গুঁড়ো গাছের সারের কাজ করে। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট প্রচুর থাকায়, মাছের গুঁড়ো সার হিসেবে মূল্যবান। হাঙ্গর মাছের যকৃৎ থেকে অতি উপকারী 'হাঙ্গর-মাছের যকৃৎ-তেল' তৈরি হয়। যকৃৎ-তেল-তৈরির কারখানাটিও জোনপুটে অবস্থিত। হাঙ্গরের চামড়ায় কাঁটা থাকে, তাই হাঙ্গরের চামড়া শুকিয়ে পরিষ্কার ক'রে সেটিকে sand-paper হিসেবে, ভালো কাঠ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়। নারিকেল উদ্ভিদের মতো মাছের উপকারিতাও যথেষ্ট।

৩। **হাঁস-মুরগী** (*Poultry birds*) : সুস্থ দেহ নিয়ে বাঁচতে হলে, মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য একান্ত দরকার। হাঁস-মুরগী আমাদের গৃহপালিত পাখী। এদের ডিম ও মাংস আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ প্রোটিন ও ভিটামিন সরবরাহ করে। মাছের চাষ যেমন একদিকে পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, পুষ্টিকর ও খাদ্য-সমস্যার সমাধান করে, তেমনি এর একটি ব্যবসায়গত লাভজনক দিক আছে। হাঁস ও মুরগী পালনও তেমনি ব্যবসায়ের দিক থেকে লাভজনক। মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট—সর্বত্র পোলট্রি-শিল্প লাভজনক ব্যবসায় হিসেবে দ্রুত প্রসারলাভ ক'রে চলেছে।

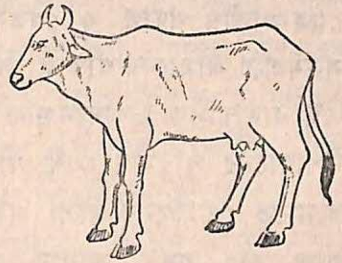
হাঁস : গৃহস্থের নিজের পুকুর থাকলে, হাঁস-পালনে অসুবিধে হয় না। হাঁস জলে চলাফেরা করে, কিন্তু স্থলে ডিম পাড়ে। বাড়ির কাছাকাছি জলাশয় থাকলে, হাঁস-পালনে অসুবিধে হয় না। হাঁস পুকুরের গুগলি বা শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি ধ'রে খায়। হাঁসের ডিমের চাহিদা প্রচুর, কিন্তু এর মাংস অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। দেশী হাঁস সাধারণতঃ ৫০।৬০টির বেশী ডিম দেয় না। তবে এগুলি খেতে সুস্বাদু। রানার এদেশের একজাতীয় উৎকৃষ্ট হাঁস। এদের শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রায় সোজা। গলাটি লম্বা। খাকি ক্যাম্পবেল ভারতীয় ও রানার হাঁসের মিশ্রণে সৃষ্টি। হাঁসগুলি খাকি রঙের ও পুরুষদের গলায় উজ্জ্বল সবুজ-আভা-যুক্ত কালচে রঙ থাকে। এরা বছরে প্রায় ২০০ কিংবা তারও

বেশী ডিম দেয়। মাছের গুঁড়ো, খোল ও তার সঙ্গে শামুক জলে সিদ্ধ ক'রে দিলে, হাঁস তৃপ্তি ক'রে খায়। হাঁসের ডিমে ১০ গ্রাম প্রোটিন, ৬ গ্রাম ফ্যাট, ৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১২০ মিলিগ্রাম ফস্‌ফরাস, ২৭ মিলিগ্রাম লোহা, ৫০০ ইউনিট ভিটামিন-এ, ১০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন-বি, ২২ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি ও ২৫০ ইউনিট ভিটামিন-ডি পাওয়া যায়। ডিম ও মাংসের জন্য হাঁসের চাষ হয়ে থাকে।

মুরগী (*Hen*)ঃ দেশী মুরগীর নানা জাতের মধ্যে অসীল, মালয়ী ও চাটগেঁয়ে প্রধান। অসীল বেশ বড় আকারের মুরগী। এরা ডিম কম দেয়। ওজন এদের ৯-১০ পাউণ্ড। শরীরে প্রচুর মাংস এবং তা খেতে সুস্বাদু। চাটগেঁয়ে মুরগী আকারে ছোট। এদের মাংস খুব সুস্বাদু। এরা বছরে ১০০ বা তারও বেশী ডিম দেয়। **হোয়াইট লেগ্‌হর্ন** মুরগীর জন্মস্থান ইটালি দেশের লেগ্‌হর্ন নামক স্থানে। বছরে এরা ডিম দেয় ১৫০ থেকে ২০০টি। **ব্ল্যাক মিনার্কা** মুরগীর জন্মস্থান ভূমধ্যসাগরের মিনার্কা নামক দ্বীপে। এই জাতের মুরগী ডিম দেরি ক'রে দেয়। **রোড আইল্যাণ্ড রেড** মুরগী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যাণ্ড দ্বীপের বাসিন্দা। বছরে এরা প্রায় ১৫০টি ডিম দেয়। **নিউ হ্যাম্পশায়ার** মুরগীর সঙ্গে রোড আইল্যাণ্ডের দেহের মিল আছে। এরা খুব অল্পবয়সে ডিম পাড়ে ও ভালো ডিম দেয়, বছরে ১৫০—১৮০টি ক'রে। নিউ হ্যাম্পশায়ার আমাদের দেশে বেশী পালন করা হয়। **প্লীমাথ রক** মুরগীর জন্ম মার্কিন মুলুকে। এদের ওজন সাত থেকে নয় পাউণ্ড। এরা বছরে অন্ততঃ ১৫০টি ক'রে ডিম পাড়ে। **লাইট সাসেক্স** মুরগীর জন্ম ইংল্যাণ্ডে। এরাও বছরে প্রায় শ'-দেড়েক ডিম পাড়ে। একটি মুরগীর ডিমে প্রোটিন—৮ গ্রাম, ফ্যাট—৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম—৪০ মিলিগ্রাম, ফস্‌ফরাস—১২৪ মিলিগ্রাম, লোহা—১৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ—৫০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি—১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি—২০০ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন-ডি—২৫০ মিলিগ্রাম পাওয়া যায়।

৪। **গোরু** (*Cow*)ঃ গো-পালন মানব-সমাজের প্রাচীন প্রথা। গোরু গৃহপালিত পশু এবং মানবের অতি উপকারী প্রাণী। ভারতে

নানা জাতের গোরু দেখা যায়। মাঠে-বাগানে চ'রে গোরু তার খাদ্য যোগাড় ক'রে নেয়। গোরুর খাদ্য গমের ভুষি, সরিষার খোল ও শুকনো খড়। উপরোক্ত পদার্থগুলিকে নানা পরিমাণে জলে মিশিয়ে গোরুকে খেতে দেওয়া হয়। বাচ্চা দেবার পরে গোরু দুধ দেয়। এক বছর থেকে দুই বছর পর্যন্ত গোরু ক্রমাগত দুধ দিয়ে যায়। ভাগলপুরী গোরু ঠিকমতো খাদ্য পেলে, দিনে কুড়ি সেরও দুধ দিতে পারে। গোরুর দুধ শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে বৃদ্ধদের পক্ষেও পুষ্টিকারক ও সহজ-পাচ্য। ষোলো আউন্স দুধের মধ্যে প্রোটিন—৫৪ গ্রাম, ফ্যাট—৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম—২৪০ মিলিগ্রাম, ফস্‌ফরাস—১৫৬ মিলিগ্রাম, লোহা—৬০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ—৩০৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি—৬০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি—২৫৮ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন-ডি—২০০ মিলিগ্রাম থাকে। কচি ঘাস, পাতা, ভুট্টা বা ধান-গোত্রীয় উদ্ভিদ্ গোরুকে খেতে দিলে, গোরুর দুধ বাড়ে। গোরুর দুধে ছানা হয়। ছানা থেকে নানাপ্রকারের সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। আমাদের দেশে অসংখ্য খাবারের দোকান বা মিষ্টির দোকান প্রধানতঃ গোরুর দুধের উপর নির্ভরশীল। বড় বড় কারখানায় গোরুর দুধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুকিয়ে গুঁড়ো করা হয়। গুঁড়ো-দুধে মানুষের শরীরের পুষ্টি-কারক অন্যান্য ধাতব লবণ ও ভিটামিনও মিশিয়ে দেওয়া হয়। ভালো গুঁড়ো-দুধের খুবই চাহিদা। গোরুর দুধ কতটা হবে তা গাভীর উপর নির্ভর করে না; ভালো জাতের ষাঁড়ের উপর নির্ভরশীল। গোরুর চামড়ায় জুতো তৈরি হয়, তা ছাড়া নানারকমের ব্যাগ ও স্যুটকেসও আজকাল গোরুর চামড়া দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। গোরুর হাড় গুঁড়িয়ে সারের চাহিদা মেটানো হয়।



৮৫নং চিত্র—গোরু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্য (Food)

যে জিনিস খেলে দেহের তাপ-সংরক্ষণ ও দেহের ক্ষয়পূরণ হয়ে দেহকে বৃদ্ধি করে ও ক্লান্তিকে দূর করে, সেইরকম দ্রব্যই 'খাদ্য'। খাদ্য হিসেবে আমরা দুধ, ঘি, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস ও তরি-তরকারি গ্রহণ করি। এইসব বস্তুর মধ্যে যে-সব রাসায়নিক উপাদান আছে, সেগুলি দ্বারা আমাদের শরীরের গঠন, ক্ষয়পূরণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় এবং এর ফলে আমরা সুস্থ থেকে নিজেদের জীবনীশক্তি বাড়াতে পারি। প্রোটিন, স্নেহ-জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার—এই তিনরকমের রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে আমাদের খাদ্য-তালিকা তৈরি করা হয়। প্রায় প্রতিটি খাদ্যেই এই রাসায়নিক উপাদানগুলি কম-বেশী থাকে। যে খাদ্যে যে-জাতীয় উপাদানের পরিমাণ বেশী থাকে, তাকে সেইজাতীয় খাদ্য বলা হয়। ছানাতে প্রোটিনের মাত্রা খুব বেশী থাকায়, ছানাকে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য বলা হয়। আবার, মাখনে তেল বা স্নেহ-জাতীয় উপাদানের পরিমাণ বেশী থাকে, তাই মাখন স্নেহ-জাতীয় খাদ্য। সেইরকম মধু, চিনি বা গুড়ে শ্বেতসার বা শর্করা থাকায়, এগুলিকে আমরা শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য বলি।

প্রোটিন, স্নেহ-পদার্থ ও শ্বেতসার—প্রত্যেক প্রকারের খাদ্য-উপাদানই আমাদের দেহের তাপ-রক্ষা, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও শরীরের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এদের মধ্যে গুণের তারতম্য থাকলেও, প্রতিদিনের খাদ্যে বা খাদ্য-তালিকায় প্রত্যেকটিরই সমান প্রয়োজনীয়তা আছে। স্নেহ ও শ্বেতসার দেহে প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চার করে এবং প্রোটিন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটায়।

১। *স্নেহ-জাতীয় পদার্থ* (**Fats and oils**) : তেল, ঘি, মাখন, ননী, চর্বি, নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি খাদ্যবস্তুতে স্নেহ-জাতীয় উপাদান অনেক বেশী থাকে, তাই এদের স্নেহ-জাতীয় খাদ্য বলা হয়। স্নেহ-জাতীয় খাদ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে; কার্বনের তুলনায়

অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। স্নেহ-জাতীয় খাদ্য গ্লিসারিন, স্টিয়ারিক অ্যাসিড এবং ওলিক অ্যাসিড—এই তিনটি রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়। শুয়োরের চর্বি, বা গালানো চর্বি, বা শার্ক-লিভার-তেলে স্নেহ-জাতীয় উপাদানের মাত্রা প্রায় শতকরা একশো ভাগ। তেল বা চর্বির পরিমাণ অনুযায়ী স্নেহ-জাতীয় পদার্থের উৎসগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা—(ক) **প্রথম শ্রেণীর স্নেহ-পদার্থ**ঃ এইসব খাদ্যে একশো ভাগই স্নেহ-পদার্থ থাকে। ঘি, মাখন, চর্বি, বিভিন্ন প্রকারের তেল, যেমন—বাদাম-তেল, বনস্পতি, সরষের তেল, নারিকেল-তেল, কড-মাছের তেল, শার্ক-মাছের তেল—এইগুলি প্রথম শ্রেণীর উৎস। (খ) **দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহ-পদার্থ**ঃ এইরকমের খাদ্যে শতকরা 40 থেকে 60 ভাগ স্নেহ-পদার্থ থাকে। বিভিন্ন প্রকারের বাদাম, যেমন—চীনে-বাদাম, কাজু-বাদাম, পেস্তা-বাদাম, আখরোট, নারিকেল—এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস। (গ) **তৃতীয় শ্রেণীর স্নেহ-পদার্থ**ঃ ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি এই শ্রেণীর স্নেহ-পদার্থ। শতকরা 6 থেকে 10 ভাগ স্নেহ-পদার্থ উপরোক্ত পদার্থের মধ্যে থাকে। স্নেহ-পদার্থে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-ডি দ্রবীভূত হয়। দুটি ভিটামিনই স্নেহ-পদার্থে আছে, তাই শরীর তা সহজেই গ্রহণ করে। স্নেহ-পদার্থ দেহের কর্মশক্তি বাড়ায়, তাপ সৃষ্টি করে এবং দেহে তাপ সঞ্চয় ক'রে রাখে। কিন্তু বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হলে, তা মেদ-বৃদ্ধি করে এবং মানুষ স্থূল হয়ে যায়।

২। **শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য (Carbohydrates)**ঃ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য তৈরি হয়। কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলের অনুপাতেরই সমান। শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য তিন ভাগে বিভক্তঃ (ক) শর্করা (*Monosaccharides*)—এই ধরনের শ্বেতসার শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মস্তিষ্কের কোষ এই ধরনের শ্বেতসারে স্বাভাবিক কাজ করে। দ্রাক্ষা-শর্করা বা দুগ্ধ-শর্করা (গ্লুকোজ ও ফ্রাকটোজ) এর উদাহরণ। (খ) **সংযুক্ত শর্করা** (*Disaccharides*)—এইজাতীয় খাদ্য

বিশুদ্ধ শর্করার দুই কণার সমান। সাদা চিনি, লাল চিনি ও শস্য-শর্করা (মলটোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ) এর উদাহরণ। (গ) ঘনীভূত শর্করা (*Polysaccharides*)—এইজাতীয় খাদ্য দুই বা দুইয়ের বেশী বিশুদ্ধ শর্করার মিশ্রণে তৈরি হয়ে থাকে। কোন কোন খাদ্যে ঘনীভূত শর্করার মধ্যে একটি বিশুদ্ধ শর্করা খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায় ; যেমন ঃ স্টার্চ—এটি একটি ঘনীভূত শর্করা, এতে গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষা-জাতীয় শর্করাই প্রধান। সর্বপ্রকার শর্করা আমরা উদ্ভিদ্-জগৎ হতেই পাই। তাই শর্করার উৎস উদ্ভিদ্। দেহের তাপ বা শক্তি যোগানো কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় খাদ্যের প্রথম ও প্রধান কাজ ব'লে একে 'জ্বালানী খাদ্য' বলা হয়। শ্বসন, চক্রাবর্তন, পাচন, রেচন প্রভৃতি সবরকমের বিপাকীয় কাজের জন্য শর্করা প্রাথমিক শক্তি যোগায়। মানুষের রক্তে শতকরা 0·1 ভাগ গ্লুকোজ থাকে। শর্করা রক্তের ক্ষারত্ব রক্ষা করে, প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য-পরিপাকে সহায়তা করে। অতিরিক্ত শর্করা দেহে চর্বিতে পরিণত হয়।

শর্করা প্রোটিনের অম্লাধিক্য নষ্ট করে। যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা গ্রহণ করলে, দেহে কম পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যের দরকার হয়। সেইজন্য কার্বোহাইড্রেটকে প্রোটিন-বাঁচোয়া খাদ্য বলা হয়। কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের কর্মশক্তি বাড়াবার ও তাপ সঞ্চয় করবার ক্ষমতা প্রায় ছ'গুণ বেশি।

৩। **প্রোটিন (Protein)**—জীবের দেহরক্ষার জন্য প্রোটিনের ভূমিকা সর্বপ্রধান। প্রোটিন থেকেই জীবনের স্পন্দন আরম্ভ হয়েছে। তাই প্রোটিন ছাড়া কোন প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সব প্রোটিনেই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের উপাদান থাকে। আবার অধিকাংশ প্রোটিনেই গন্ধক যুক্ত থাকে। কখনও কখনও ফস্‌ফরাস, লোহা ও অন্যান্য মৌলিক পদার্থও প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রোটিনকে যদি ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা যায়, তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। দেখা গিয়েছে, প্রধানতঃ দশ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড দেহের পক্ষে অপরিহার্য।

গ্লাইসিন (*Glycine*, $C_2H_5O_2N$) সবচেয়ে সরল প্রোটিন। মানুষের দেহের কাজে লাগার আগে প্রোটিন ভেঙে সরল হয়ে অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। প্রোটিনে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। তাই দেহের নাইট্রোজেন-সমতা প্রোটিন বজায় রাখে। অসুস্থতার সময়ে, দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে ও দেহের বৃদ্ধির সময়ে নাইট্রোজেন বেশী মাত্রায় প্রয়োজন। উচ্চ-ক্ষমতা-সম্পন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিড-প্রদানকারী প্রোটিনকে **উচ্চশ্রেণীর প্রোটিন** বলা হয়। আবার নিম্ন-ক্ষমতা-সম্পন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিড-প্রদানকারী প্রোটিনকে **নিম্নশ্রেণীর প্রোটিন** বলা হয়। উৎপত্তি অনুযায়ী প্রোটিন দুই শ্রেণীর; যথা—যে-সমস্ত প্রোটিন প্রাণিদেহ হতে পাওয়া যায়, তাদের **প্রাণিজ প্রোটিন** বলা হয়। আবার যে-সমস্ত প্রোটিন উদ্ভিদ্-দেহ হতে পাওয়া যায়, তাদের **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন** বলে। আমাদের দেহের প্রধান অংশগুলি প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযোগে দেহের ভিতর প্রোটিন তৈরি হয়। মাছ, মাংস ও ডিমে প্রোটিনের অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির সবই পাওয়া যায়। এইসব অ্যামিনো অ্যাসিড মানুষের দেহের ভিতর প্রোটিন তৈরি করে। **প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন** হচ্ছেঃ মাছ, মাংস, ডিম, যকৃৎ, বৃক্ক, ছানা, দুধ, দধি, পনির, সবুজ শাক-সবজি, সয়াবীন-বীজ ইত্যাদি। নিম্ন-ক্ষমতা-সম্পন্ন অ্যামিনো-অ্যাসিড-প্রদানকারী প্রোটিনকে **দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন** বলে। উদাহরণঃ চাল, আটা, যব, বিভিন্ন রকমের ডাল, বাদাম, আলু, গাজর, বীট, শালগম, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি। ডাল ও বাদামে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। 'প্রোটিন' শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রধান বা প্রথম। তাই বিবিধ খাদ্যের মধ্যে মানুষের দেহে প্রোটিন সর্বপ্রধান। প্রোটিন দেহে সঞ্চিত হতে পারে না। প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড ভেঙে গ্লুকোজে উৎসেচকের দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

প্রোটিনের কাজঃ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটায়। ইন্ধন-হিসেবে প্রোটিন শরীরে তাপ সৃষ্টি করে এবং তাপ সংরক্ষণ করে। 1 গ্রাম প্রোটিন-দহনে 4·1 kg. ক্যালোরি

তাপ উৎপন্ন হয়। প্রোটিন দেহে 'মেটাবলিজম' বা বিপাকীয় কার্য বাড়ায়। পরিশ্রমে আমাদের দেহে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, সেটি অ্যামিনো অ্যাসিড দ্বারাই পূর্ণ হয়। দেহের পরিপোষণ ও দেহের ক্ষয়পূরণ—এই দুই ধরনের কাজের জন্যই প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডকে 'দেহ-গঠনকারী ইষ্টক' (Body-building bricks) বলা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড পাচনের সময়ে উৎসেচক-নিঃসরণে সহায়তা করে। প্রোটিন কর্মশক্তি ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি করে। প্রোটিনের সহায়তায় স্নায়ু সতেজ হয়। ক্ষয়পূরণ, তাপ-সংরক্ষণ, দেহের পুষ্টি ও দেহের বৃদ্ধি—এই চারিটি প্রধান কাজ প্রোটিনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ায়, প্রোটিনকে বিবিধ খাদ্যের মধ্যে মুখ্য বা প্রধান বলা হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঔষধের কাজে উদ্ভিদ্ ও ক্ষতিকারক প্রাণী

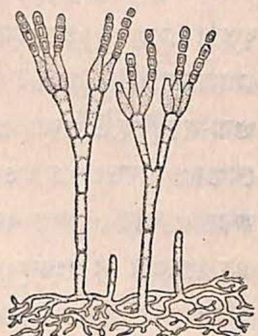
(Medicinal plants, and Pest and disease producing Animals)

(ক) *ঔষধের কাজে উদ্ভিদ্* (**Medicinal plants**)

১। পেনিসিলিয়ম (**Penicillium**)

থ্যালোফাইটার অধীনস্থ ছত্রাক-বিভাগের অ্যাসপারজিলসি শ্রেণীর একরকমের ছত্রাকের নাম 'পেনিসিলিয়ম'। সাধারণ ছাতা মিউকরের মতো পেনিসিলিয়মও মৃতজীবী বা পচা তরি-তরকারি, ফল, প্রাণীদের রেচন-পদার্থের উপর বা পচা চামড়া ইত্যাদির উপর জন্মায়। পেনিসিলিয়মের কয়েকটি জাত মানুষের নাকে, কানে, গলার ভেতরে, এমনকি ফুস্ফুসেও রোগের সৃষ্টি করে। মাইসিলিয়ম নামে অসংখ্য শাখা-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম নালীর সাহায্যে এরা পচা লেবু বা পাউরুটির মধ্যে ঢুকে যায় এবং পচা লেবু বা পাউরুটির মধ্যে থেকে রাসায়নিক দ্রব্য শোষণ করে। মাইসিলিয়মের সূক্ষ্ম নালীর আরও সূক্ষ্ম রাইজয়েডের মতো সুতো-নালী পচনশীল দ্রব্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা থেকে রস শোষণ

করে। মাইসিলিয়মের যে-সমস্ত সূক্ষ্ম নালী পচনশীল পদার্থকে ত্যাগ ক'রে উপরের দিকে সোজা উঠে আসে, সেগুলিকে হাইফা (*Hyphae*) বলা হয়। পচা আলুতে যে-সমস্ত পেনিসিলিয়ম জন্মায়, তার মাইসিলিয়ম প্রথমে রঙে সাদা তুলোর মতো, পরে হলদেটে হয়ে, শেষে এর রঙ লালে পরিণত হয়।



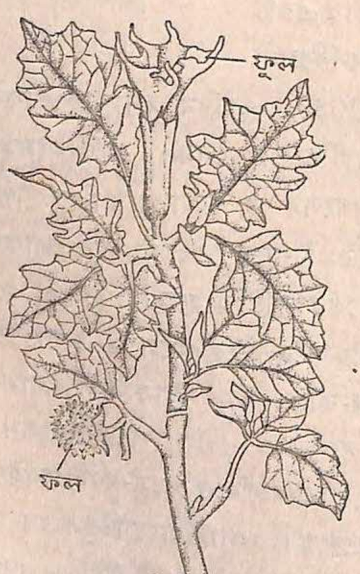
পেনিসিলিয়ম

৮৬নং চিত্র

এই পেনিসিলিয়ম-এর (*Penicillium notatum*) দেহ থেকে একরকমের জৈবরস নিঃসৃত হয়। এই নিঃসৃত দেহরস ব্যাক্‌টিরিয়া প্রতিরোধ এবং বিনষ্ট করে। তাই পেনিসিলিয়মের দেহরসকে **জীবাণু-প্রতিরোধক** বা **অ্যান্টিবায়োটিক্স** (*Antibiotics*) বলা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক্স-এর আবিষ্কার একটি চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে হয়। জীব-বিজ্ঞানী অ্যালেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (1881—1955) একদিন স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু কাঁচের পাত্রে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করেছিলেন। সেটি অনেকদিন ঢাকা পড়ে ছিল। হঠাৎ একদিন দেখলেন যে, চক্রাকারে কিছু নীলাভ-সবুজ ছত্রাক কাঁচের পাত্রে জন্মেছে। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী **স্ট্যাফাইলোকক্কাস** (*Staphylococcus*)-এর মধ্যে ছত্রাকের সৃষ্টি হয়েছে। তা তো হতেই পারে। ফ্লেমিং সেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে মনে ক'রে ফেলে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেখলেন, ছত্রাকের ধারে-কাছে কোন স্ট্যাফাইলোকক্কাস-এর জীবাণু নেই। ফ্লেমিং অবাক হয়ে গেলেন। পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, নীলাভ-সবুজ ছত্রাক-ই পেনিসিলিয়ম, যার দেহনিঃসৃত রস-ই স্ট্যাফাইলো-কক্কাস জীবাণুকে বিনষ্ট ক'রে দিয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক্স-এর এই আবিষ্কার মানব-সমাজে যুগান্তর এনে দিল। 1938 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অ্যান্টিবায়োটিক্স-এর কারখানা স্থাপন করা হয় এবং অসংখ্য আহত সৈনিকের জীবন পেনিসিলিনের সাহায্যে রক্ষা পায়। এরপরে 1944 খ্রীষ্টাব্দে অ্যাকটিনোমাইসিটিস-এর দেহ থেকে **সেলম্যান ওয়াক্সম্যান** (Selman

Waksman) স্ট্রেপটোমাইসিন (*Streptomycin*) আবিষ্কার করেন। ক্ষত, ফুস্‌ফুসের রোগ, পেটের রোগ, যকৃতের ও বৃক্কের রোগে পেনিসিলিন ব্যবহৃত হয়।

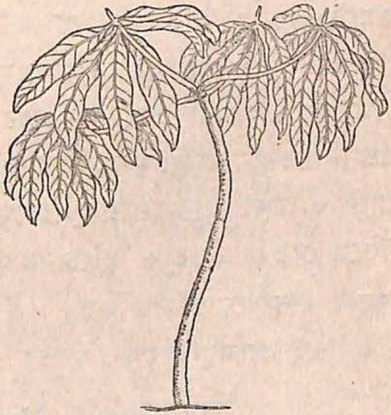
২। **ধুতুরা (Datura fastuosa)** : গ্রাম-বাংলায় শিবের পুজোয় ধুতুরা ফুলের প্রয়োজন। এটি না হলে শিবের পুজো হয় না। এটি সোলানাসিঈ শ্রেণীর বা বেগুন জাতের গাছ। ধুতুরা দ্বিবীজপত্রী গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ্। গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই ধুতুরা গাছ দেখা যায়। গাছগুলি বেগুন গাছের চেয়েও বড় হয়। এদের পাতা সরল ও শিরা-বিন্যাস করতলাকার। বড় বড় সাদা বা বেগুনী ফুল একটি ক'রে শাখায় ফোটে। এর ফলের বহিঃত্বক্ কণ্টকপূর্ণ। ফলটি বিদারী অর্থাৎ পেকে শুকিয়ে গেলে ফেটে যায়, ফলে বীজগুলি স্বভাবতঃই ছড়িয়ে পড়ে। এর পাতা ও ফুলের অংশ থেকে স্ত্রামো-নিয়ম নামক ঔষধ তৈরি হয়। ফলের ভেতরে হাইওসিয়্যামাইন, অ্যাট্রোপিন ও স্কোপোল্যামাইন নামে কয়েকটি উপক্ষার (অ্যালকালয়েড) থাকে। ধুতুরার বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীর নানা জায়গায় বহুদিন হতে নেশার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ধুতুরার বীজে ডাটুরিন (*Daturine*) নামক বিষ থাকে। বীজ বেটে মিষ্টি দিয়ে সরবত ক'রে খেলে নেশা হয়। বেশী পান করলে মৃত্যু হয়। ফোড়া বা ব্যথায় ধুতুরার পাতা গরম ক'রে লাগালে, ব্যথা কমে যায় ও ফোড়া ফেটে যায়। ফোলা, বাত, কানের ব্যথা ও মাম্‌স ইত্যাদি রোগে ধুতুরা-পাতার ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ধুতুরার পাতা ও



৮৭নং চিত্র—ধুতুরা গাছ।

পুষ্পদণ্ড শুকিয়ে, চূর্ণ ক'রে মধু দিয়ে সেবন করলে, হুপিং-কাফ ও হাঁপানি ভালো হয়।

৩। **সর্পগন্ধা (Rauwolfia serpentina)**: সর্পগন্ধা দ্বিবীজপত্রী বহুবর্ষজীবী গুল্ম-জাতীয় উদ্ভিদ্। ভারতের বহু জায়গায় সর্পগন্ধার (*Serpentina*) চাষ করা হয়। এর মূল ও মূলের বহিঃত্বক্ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। মূলের বহিঃত্বকে রাউলফিন (*Rauwolfine*) নামে এক-রকমের উপক্ষার থাকে। রাউলফিন মানুষের রক্তচাপ রোগ কমিয়ে দেয়। বেশী জ্বর হলে, এর প্রয়োগে জ্বর কমে যায়। মূলের বহিঃত্বক্ বা ছাল সিদ্ধ ক'রে, জলটুকু ছেঁকে পান করলে, রক্তচাপের রোগী ধীরে-ধীরে আরোগ্যলাভ করে। মূলের ছালের মধ্যে রেসারপিন (*Reserpine*) নামে আরেকরকমের উপক্ষার থাকে। এটিও ঔষধরূপে কাজ করে। অ্যাজমালিন (*Ajmaline*) ও সারপেনটাইন (*Serpentine*) নামক আরও দুটি উপক্ষার সর্পগন্ধায় পাওয়া যায়। রাতে ঘুম-না-হওয়া এবং স্নায়ু-শিথিলতায় রেসারপিন-সেবনে রোগী উপকার পায়। পাগলের ঔষধরূপে এটি বিখ্যাত। সর্পগন্ধা গুল্মের প্রধান মূলটি স্থূল, লম্বা এবং শাখাবিহীন। এটি প্রায় দশ সেন্টিমিটার লম্বা হতে দেখা যায়। সর্পগন্ধা গুল্মের ফুল ছত্রাকার প্রকৃতির। এই গুল্মটির চাষ সমতলভূমি ও পাহাড়ের ঢালু জায়গায় হয়। কলিকাতার উদ্ভিদ্-উদ্যানে (Botanic gardens), পাহাড়িয়া রঙ্গো, মঙ্গপো এবং জলঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে সর্পগন্ধার চাষ করা হচ্ছে। দেরাদুনের 'বন-গবেষণা কেন্দ্র', মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার খাণ্ডালার আঞ্চলিক গবেষণার ল্যাবরেটরিতে, জম্মু ও কাশ্মীরে এবং



সর্পগন্ধা

৮৮নং চিত্র

নীলগিরির পাহাড়ী অঞ্চলে সর্পগন্ধার চাষ ও তার গুণাগুণের গবেষণা হচ্ছে। শীতকালে সর্পগন্ধা গুল্মের বৃদ্ধি হয়। তিন বা চার বছরের গুল্মের মূলের ছাল ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত গুল্মটিকে মাটি থেকে সাবধানে তুলে নিতে হয়। শীতকালে উপক্ষারগুলি মূলে বেশী জমা হয় ব'লে শীতেই গুল্মগুলিকে তুলতে হয়। সমগ্র মূলটি কেটে খুব ভালো ক'রে ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। মূলটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, চাষীরা বাতাস-বন্ধ কৌটায় শুকনো মূলগুলিকে পুরে বিক্রির জন্য বাজারে পাঠিয়ে দেয়। সর্পগন্ধার মূল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আমাদের দেশে কবিরাজেরা এটি বহুদিন ধ'রে রক্তচাপের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার ক'রে আসছেন।

(খ) ক্ষতিকারক প্রাণী
(Pest and disease producing Animals)

জীব-জগতে নানারকমের প্রাণী মানুষের যেমন উপকারে আসে, তেমনি অনেক জীব মানুষের ক্ষতি করে, এমনকি এদের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। হাঁস, মুরগী, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও শুয়োর আমাদের উপকারী প্রাণী। এদের ডিম বা মাংস মানুষের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য। তেমনি মাছি, মশা, ইঁদুর ও ছুঁচো আমাদের প্রচুর ক্ষতি করে। মাছি ও মশা বহু মারাত্মক রোগের জীবাণু বহন ক'রে মানুষের দেহে ছড়িয়ে দেয়। ইঁদুর ও ছুঁচো অত্যন্ত ক্ষতিকারক জীব। প্লেগ রোগ ইঁদুর-ই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়।

এই ধরনের কয়েকটি ক্ষতিকারক প্রাণীর বিবরণ দেওয়া হ'ল :

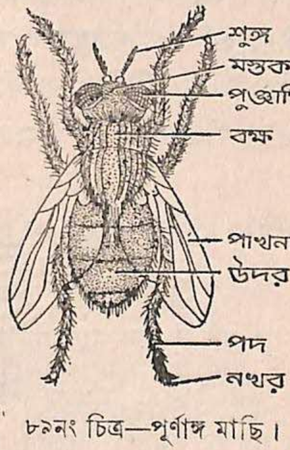
১। মাছি (House-fly) : মাছি এমন একটি প্রাণী, যার জন্যে প্রতিবছরে লক্ষ লক্ষ লোকের নানারকমের রোগ হয়। টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, উদরাময়, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগ প্রধানতঃ মাছির মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

মাছি অমেরুদণ্ডী সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এরা আকারে সিকি ইঞ্চি লম্বা এবং মাথা, বুক ও পেট—এই তিন ভাগে

বিভক্ত। এদের মাথায় হুলের বদলে শুঁড় বা প্রোবসিস্ থাকে এবং এই প্রোবসিসের সাহায্যে এরা খাদ্য শোষণ ক'রে খায়। এদের দেহে এক-জোড়া পাখা ও তিন-জোড়া পা থাকে। দেহ ও পা-গুলি লোমশ। লোমশ দেহে বীজাণু-দুষ্ট মলমূত্র, কফ ও থুথু আটকে থাকে এবং মাছি তাই নিয়ে উড়ে এসে, খোলা খাদ্যদ্রব্য, যথা—কাটা ফল, আ-ঢাকা দোকানের খাবার, বাড়িতে আ-ঢাকা ভাত-ডাল-তরকারি ইত্যাদির উপর বসে, তখন মাছি তার পাখা ও শুঁড় নেড়ে বীজাণু ছড়ায় এবং ঘন ঘন মলত্যাগ ক'রে খাদ্যদ্রব্যাদি জীবাণু-মিশ্রিত ও দূষিত করে।

মল, মূত্র, কফ, থুতু, বমন, আবর্জনা, আঁস্তাকুড়, গলিত শব, পচা গোবর ইত্যাদি নরম ও নোংরা জিনিসই মাছিদের আদর্শ খাদ্যসামগ্রী এবং এইসব নোংরা বস্তুর পরিবেশেই তাদের বাসস্থান।

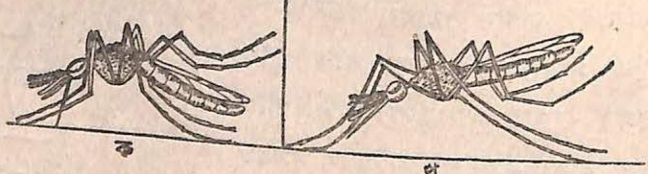
মাছির জীবনেও অন্যান্য পতঙ্গের মতো চারটি অবস্থা বা দশা দেখা যায়। প্রথমতঃ, স্ত্রী-মাছি নোংরা জিনিসের উপর 120 থেকে 500টি ডিম একের পর এক ক'রে পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে অতি ক্ষুদ্র ও কলে-ছাঁটা চালের মতো। আট থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ডিমগুলির মধ্য থেকে সাদা, অতি সূক্ষ্ম পোকা বের হয়ে আসে। এরাই মাছির শূককীট। পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে শূককীটগুলি গুটিয়ে ছোট ছোট মাছির আকার ধারণ করে; এদের মূককীট বলে। এরা প্রথমে লাল, পরে হলদে এবং শেষে কালো রঙের দেখতে হয়। শূককীট যত তাড়াতাড়ি নোংরা খায়, তত তাড়াতাড়ি মূককীটে পরিবর্তিত হয়। এদের খাওয়ার ধরন দেখে মহামতি লিনিয়স বলেছেন যে, একটি মৃত ঘোড়াকে সিংহের চেয়ে এই পতঙ্গের (মাছির) শূককীটেরা তাড়াতাড়ি খেতে পারে। শূককীটে মাথা বা পা থাকে না। মূককীট বা পিউপার ভেতরে শূককীট-গুলির আমূল পরিবর্তন হয়। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে পিউপা লম্বালম্বিভাবে



৮৯নং চিত্র—পূর্ণাঙ্গ মাছি।

বিদীর্ণ হয় ও তার ভেতর থেকে মাছি বের হয়ে আসে। মাছি যেমন রোগ বিস্তার করে, তেমনি প্রচুর আবর্জনা খেয়ে আমাদের কিছু উপকারও করে। খাদ্যবস্তুর উপর মাছি যাতে বসতে না পারে সে-দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা দরকার। সাধারণ মাছি, যেগুলিকে আমরা ঘরে-বাইরে বা নোংরা বস্তুর উপর দেখি, এদের বৈজ্ঞানিক নাম মুস্‌কা ডোমেস্‌টিকা।

২। মশা (*Mosquitoes*)ঃ বাঘ ও সিংহের চেয়েও মশা মানব-জাতির পক্ষে বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। নানারকমের ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও ডেঙ্গুজ্বর এদের দ্বারা বিস্তারলাভ করে। পীতজ্বরও মশার কামড়ে সংক্রামিত হয়। এ ছাড়া, মশার দংশনে নানারকমের চর্মরোগও বিস্তারলাভ করে। মাছির মতো মশাও পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। স্ত্রী-মশা বা মশকী-ই কেবল রোগবাহক এবং রক্তশোষক। এদের মুখে আটটি উপাঙ্গ থাকে। এদের সাহায্যে মশকী মানুষের দেহে ছিদ্র ক'রে রক্ত শোষণ করে এবং এই রক্ত-শোষণের সময়ে সূক্ষ্ম জীবাণুগুলিকে মানুষের দেহের ভেতরকার রক্তস্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। এনোফিলিস মশকী নানারকমের ম্যালেরিয়ার জীবাণু, কিউলেক্স ফাইলেরিয়ার জীবাণু এবং এডিস ডেঙ্গু ও পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে।



৯০নং চিত্র—কিউলেক্স ও এনোফিলিস মশা।

মাছিদের মতো এদের জীবনচক্রেও ডিম, শূককীট ও পূর্ণাঙ্গ মশা দেখা যায়।

এনোফিলিসের ডিমগুলি বোটের মতো এবং প্রতি ডিমের দুইপাশে বাতাস-ভেলক থাকে। কিউলেক্স মশকীর ডিমগুলি সিগারেটের মতো এবং প্রতি ডিমেই দুইপাশে বাতাস-ভেলক থাকে না। এনোফিলিস পরিষ্কার জলে ডিম দেয়, অপরপক্ষে কিউলেক্স ডোবা, নর্দমা ইত্যাদি স্থানে ডিম দেয়। এনোফিলিসের মূককীট জলরেখার সঙ্গে সমান্তরাল

হয়ে ভেসে বেড়ায়। কিউলেক্স মশকীর মূককীট মাথা নিচু ক'রে তির্যক্‌ভাবে জলে ভেসে বেড়ায়। এনোফিলিসের পিউপা দেখতে সবুজ এবং এর শ্বাসনালী খুবই ছোট। অপরপক্ষে কিউলেক্সের পিউপা সাদা এবং এর শ্বাসনালী বেশ বড়।

পূর্ণাঙ্গ এনোফিলিস মশার দেহ সরু ও লম্বা, পা ও অন্যান্য উপাঙ্গগুলি নরম। এর দেহ ধূসর বর্ণের এবং সর্বাঙ্গ শুঁয়ার দ্বারা আবৃত। অপরপক্ষে কিউলেক্সের দেহ শুঁয়ার দ্বারা আবৃত নয়। পূর্ণাঙ্গ মশার ডানাগুলিতে শিরা এবং ডানায় কালো-কালো ফুটকি থাকে। অপরপক্ষে কিউলেক্সের ডানাগুলিতে শিরা থাকে এবং একই রঙের হয়। এনোফিলিস যে-কোন স্থানে বসবার সময়ে দেহটিকে স্থানের সঙ্গে একান্তর-কোণ ক'রে বসে। অপরপক্ষে কিউলেক্স মশা যে-কোন স্থানে বসবার সময়ে দেহটিকে স্থানের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে বসে। মশা একবার ডিম দেবার সুযোগ পেলে, তা ধ্বংস করা দুরূহ। সুতরাং মশা যাতে ডিম দেবার সুযোগ না পায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। নালা বা নর্দমা পরিষ্কার করা এবং তাতে D.D.T. বা 'কেরোসিন স্প্রে' করা দরকার। বাড়ির পাশের ঝোপ-জঙ্গল, খানা বা ডোবা ইত্যাদিও পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

৩। ইঁদুর (*Rat*) ঃ পশ্চিমবাংলায় ইঁদুরের উৎপাত খুব বেশি। এরা কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত স্তন্যপায়ী শ্রেণীর রোডেনসিয়া বর্গের অন্তর্ভুক্ত। গিনিপিগ, খরগোশ, কাঠবেরালি ও পরকুপাইনও এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত। ইঁদুর ভীষণ ক্ষতিকারক। এদের দেহের মধ্যে মাথা, গলা, ধড় ও লেজ থাকে। অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিতে তীক্ষ্ণ নখ থাকে। অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতো মাথায় বহিঃকর্ণ, চোখের পাতা ও বহিঃনাসিকা থাকে। এদের দেহ লোমে ঢাকা,



ইঁদুর

৯১নং চিত্র

পৃষ্ঠদেশের রঙ কালো আর অঙ্কীয়-দেশের রঙ ধূসর। লেজ বেশ বড় হয়। দাঁতগুলির সাহায্যে এরা কাঠ পর্যন্ত কেটে ফেলতে পারে। তাই বড় কাঠের বাক্সের জামা, কাপড়, বা দামী বই এরা দাঁত দিয়ে কেটে দেয়। শস্য-ধ্বংস করা ছাড়া, গৃহস্থের বহু জিনিস কেটে ইঁদুর নষ্ট ক'রে দেয়। এমনকি বাড়ির পাকা দেওয়ালও এরা দাঁত দিয়ে কেটে ফুটো ক'রে দেয়। বড় বড় খাদ্যশস্যের গোলাবাড়িতে এদের বাস। এরা সর্বক্ষণ খায়। বিড়াল ইঁদুরের যম। এরা সুকৌশলে ইঁদুর ধ'রে খেয়ে ফেলে। ইঁদুর ধরার জন্য খাঁচা পাওয়া যায়। আজকাল ইঁদুর-মারা-চূর্ণ নামে বিষও পাওয়া যায়। খাবারের সঙ্গে এই বিষ মিশিয়ে, ছড়িয়ে রাখা হয়। পেটুক ইঁদুর খাবারের লোভে বিষ-মেশানো, ছড়ানো খাদ্য খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। এইভাবে বড় বড় গুদামে ও গোলায় আজকাল ইঁদুর মারা হচ্ছে। ইঁদুর প্লেগ রোগ বহন করে। এই রোগটি ইঁদুরের সবচেয়ে আগে হয়। এর থেকে মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পর্যবেক্ষণ

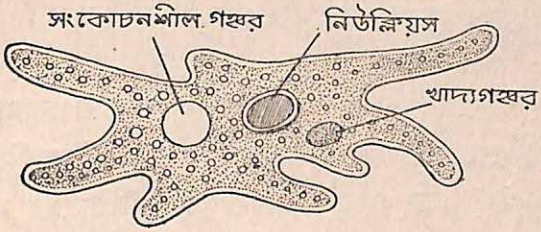
(Demonstration)

প্রাণী ও উদ্ভিদ্ পরীক্ষার জন্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার। বড় বড় বস্তু যেগুলির বহিরাকৃতি চোখে দেখা যায়, সেগুলি সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু এমন-সব জীব-জন্তু আছে যা চোখে মোটেই দেখা যায় না, বা অতি সামান্য দেখা যায়, সেগুলিকে অণুবীক্ষণের তলায় রেখে দেখা যায়। যৌগিক অণুবীক্ষণের দরকার হয় না ; সরল অণুবীক্ষণ-যন্ত্রই যথেষ্ট।

নিচে কয়েকটি প্রাণী ও উদ্ভিদের পর্যবেক্ষণের-ধারা-সহ সনাক্তকরণ-প্রণালী দেওয়া হ'ল ঃ

1. অ্যামিবা (*Amoeba*) ঃ অণুবীক্ষণের তলায় স্থায়ী স্লাইডে অ্যামিবা পর্যবেক্ষণ করা হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সজীব অ্যামিবাকে মেরে, তার দেহ নানা রঙে রঙিন ক'রে কাঁচের স্লাইডে স্থায়িভাবে

আটকে রাখা হয়। এদের বলা হয় 'স্থায়ী স্লাইড' (*Permanent slide*)। স্লাইডটিকে অণুবীক্ষণের তলায় রেখে ঠিকমতো ফোকাস করলে, প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহের বিবিধ গঠন দেখা যায়। অ্যামিবাকে এইভাবে সনাক্ত করা হয়ঃ যেমন—(ক) গঠন ও আকৃতি আণুবীক্ষণিক। (খ) এককোষী, তাই এরা প্রোটোজোয়া পর্বের অন্তর্ভুক্ত। (গ) দেহ থেকে সূক্ষ্ম অঙ্গুলির পরে কয়েকটি ক্ষণপদ বের হতে দেখা যায়। (ঘ) প্রাণীর দেহের মধ্যস্থলে নিউক্লিয়াস পরিষ্কার দেখা যায়। (ঙ) প্রাণীটির দেহের চারপাশে



৯২নং চিত্র—অ্যামিবা।

কোন আবরণ দেখতে পাওয়া যায় না। (চ) দেহের ভেতর একটি **সঙ্কোচন-প্রসারণশীল গহ্বর** (*Contractile vacuole*) এবং একটি **খাদ্য-গহ্বর** (*Food vacuole*) দেখা যায়।

2. কুঁড়ি-সহ হাইড্রা (*Hydra with bud*)ঃ কুঁড়ি-সহ হাইড্রাও এত ছোট যে, এটিকেও সরল অণুবীক্ষণের তলায় স্লাইডে ক'রে দেখতে হয়। কুঁড়ি-সহ হাইড্রার পর্যবেক্ষণ কি-ভাবে করা হয়, তা দেওয়া হ'লঃ (ক) দেহটি নলাকার ও এর ভূমিটি চওড়া। (খ) এর অগ্রাংশ উঁচু কুঁজোর মতো এবং মধ্যে একটি কর্ষিকা (*Tentacle*)-বেষ্টিত মুখছিদ্র দেখা যায়। (গ) দেহের পাশ থেকে লম্বাকার কুঁড়ি বের হতে দেখা যায় ও কুঁড়ির মুখের চারপাশে ছোট ছোট কর্ষিকাও দেখা যায়। (ঘ) দেহের পাশে মুখের দিকে ফোলা, গোলাকার



৯৩নং চিত্র
কুঁড়ি-সহ হাইড্রা।

অংশটি শুক্রাশয় এবং দেহের পাশে ও দেহের নিচের দিকে ফোল গোলাকার অঞ্চলটি ডিম্বাশয়। এই দুইটি অঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়।

কুঁড়ি-সহ হাইড্রার কর্ষিকায় ধারে-ধারে খুব সূক্ষ্ম গুঁড়ি দেখা যায়। এগুলিকে কর্ষিকার ক্লব (*Knob*) বা গুঁড়ি বলা হয়।

3. **ঈস্ট** (*Yeast*)ঃ ঈস্ট একরকমের এককোষী ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ্। খেজুরগাছের রস বাসী হয়ে গেলে বা তাতে রোদ লাগলে, সেটি ফেনায় ভরে যায়। ঈস্টের দেহ থেকে একধরনের উৎসেচক বের হয়, সেটি খেজুর-রসের গ্লুকোজকে ভেঙে কোহল তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড বের হয়, তাই রসে ফেনা হয়। ফেনা-ভরা রসে ঈস্ট প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এইরকমের সামান্য ফেনা-ভরা রস বা তাড়ি স্লাইডে রেখে অণুবীক্ষণের তলায় পর্যবেক্ষণ করলে, ঈস্টের কিছু কিছু দেখা যায়ঃ যেমন—(ক) ঈস্ট উদ্ভিদ্ এককোষী এবং এর নিউক্লিয়সের মধ্যে বেশ বড় একটা গহ্বর দেখা যায়। (খ) সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কঠিন গ্লাইকোজেন বস্তু দেখা যায়। (গ) নিউক্লিয়সের নিউক্লিয়োলাস গহ্বরে স্পষ্টই দেখা যায়, উদ্ভিদ্ ঈস্ট ক্ষণে ক্ষণে দেহের ভেতর থেকে কুঁড়ি বার করছে ও কুঁড়িটি মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। (২নং চিত্র দেখ।)

4. **স্পাইরোগাইরা** (*Spirogyra*)ঃ সবুজ যে-শ্যাওলায় পা পিছলে যায়, সেই শ্যাওলার-ই পোশাকী নাম স্পাইরোগাইরা। স্পাইরোগাইরা শৈবাল শ্রেণীর উদ্ভিদ্। সামান্য শ্যাওলা একটি স্লাইডের উপর রেখে, দুটো ছুঁচ দিয়ে শ্যাওলাগুলিকে ভাগ-ভাগ করে দিতে হয়। অতি সূক্ষ্ম চুলের মতো সরু একটা অংশ অণুবীক্ষণের তলায় পর্যবেক্ষণ করলে স্পাইরোগাইরার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়ঃ যথা—(ক) স্পাইরোগাইরার নলাকার দেহের মধ্যে লম্বা-লম্বা প্রচুর কোষ একের পর এক প্রথায় সাজানো থাকে। দুটি কোষের মধ্যে পাতলা প্রস্থ প্রাচীর দেখা যায়। (খ) কোষের মধ্যে প্যাঁচালো ক্লোরোপ্লাস্টিক-এর ফিতে পরিষ্কার দেখা যায়। (গ) ফিতের মধ্যে প্রোটিন-জাতীয় পাইরিনয়েড কঠিন বস্তু দেখা যায়। (ঘ) কোষগুলির বাইরে একটি আবরণ থাকে। এই

আবরণ কোষগুলিকে সাজিয়ে রেখে স্পাইরোগাইরার লম্বাকার গঠন তৈরি করে। (১নং চিত্র দেখ।)

5. মিউকোর (*Mucor*)ঃ মিউকোর ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ্। এরা মৃতজীবী অর্থাৎ ঘোড়া বা গোরুর বিষ্ঠা, ভেজা চামড়া, পচা ফল বা পাউরুটি প্রভৃতির উপরও জন্মায়। এদের বাইরে থেকে তুলোর শুঁয়ার মতো দেখায়। সামান্য তুলোর মতো শুঁয়া জল দিয়ে কাচের স্লাইডের মাঝখানে রেখে, তার উপর কাচের কভার-স্লিপ দিয়ে ঢেকে সেটিকে অণুবীক্ষণের তলায় রেখে পর্যবেক্ষণ করলে, মিউকোরের দেহের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। সেগুলি নিচে বলা হ'লঃ যেমন—(ক) দেহটি সূক্ষ্ম-শাখা-বিশিষ্ট বহু নালী দিয়ে তৈরি। দেহে কোষ নেই। নালীগুলিকে মাইসিলিয়ম বলে; এর ভেতরে অসংখ্য নিউক্লিয়স থাকে। একটি নালীকে হাইফা বলা হয়। (খ) কতকগুলি হাইফা সোজা উপরের দিকে খাড়াভাবে থাকতে দেখা যায়। এর শেষে একটি গোলক দেখা যায়। গোলকটিকে রেণুস্থলী (*Sporangium*) বলা হয়। (৩নং চিত্র দেখ।)

6. মস্ (*Moss*)ঃ বর্ষাকালে পুরোনো দেওয়ালে একরকমের ভেলভেটের মতো গাঢ় সবুজ রঙের খুব ছোট ছোট উদ্ভিদ্ জন্মায়, এদের মস্ বলা হয়। মস্ ব্রাওফাইটা শ্রেণীর উদ্ভিদ্। এদের বৈশিষ্ট্য খালি-চোখে বা সাধারণ লেন্স-এর তলায় পরিষ্কার দেখা যায়ঃ যেমন—(ক) এদের কাণ্ডের নিচে থেকে অসংখ্য রোম বের হয়। রোমের সাহায্যে এরা জল শোষণ করে। তাই এদের গোড়ার কাণ্ডটিকে রাইজয়েড বলা হয়। কাণ্ড থেকে সরল পাতা চক্রাকারে বের হতে দেখা যায়। (খ) কাণ্ডগুলি বড় হয়ে গিয়ে, তাদের মাথায় ক্যাপসিউল নামে একটি গোলাকার বাক্সের মতো অঙ্গ জন্মাতে দেখা যায়। এরই মধ্যে রেণু বা স্পোর জন্মায়। (গ) ক্যাপসিউলের মাথার উপর একটি টুপি থাকে। (৪নং চিত্র দেখ।)

7. ফার্ন (*Fern*)ঃ বর্ষাকালে পুরোনো বা পোড়ো-বাড়ির দেওয়ালে মস্ উদ্ভিদের সঙ্গে ফার্ন-ও দেখা যায়। ফার্ন টেনিডোফাইটা

শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌। স্যাঁতসেঁতে মাটিতে এরা জন্মায়। এদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য খালি-চোখে দেখা যায়ঃ যেমন—(ক) এদের পাতাগুলি পক্ষল-যৌগিক অর্থাৎ পায়রার পালকের মতো। প্রতিটি পত্রকের ধার কাটা-কাটা দাঁতের মতো। (খ) উদ্ভিদের গোড়া থেকে কুকুরের লেজের মতো প্রথম অবস্থায় পাতা গজাতে দেখা যায়। (গ) এদের মূল ব'লে কিছু নেই। কাণ্ডের শেষভাগ রাইজোমে পরিণত হয়ে, তা থেকে অস্থানিক মূল বের হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে। (৫নং চিত্র দেখ।)

8. কেঁচো (*Earthworm*)ঃ গোলাকার, লম্বা স্পেশিমেন-জারে একটি কেঁচোকে মৃত অবস্থায় কাঁচের প্লেটে বা ব্যাকেলাইটের প্লেটে লম্বালম্বিভাবে সুতো দিয়ে রাখা হয়। জারের মধ্যে 2% ফরমালিন জল থাকে। ফরমালিন প্রাণীটিকে পচন হতে রক্ষা করে। জারের বাইরে থেকে কেঁচোর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ যেমন—(ক) কেঁচোর মুখের উপর ফোলা ওষ্ঠটি দেখা যায়। (খ) সমস্ত দেহটি অনেকগুলি দেহখণ্ডে (*Segment*) ভাগ-করা, তা স্পষ্ট দেখা যায়। (গ) পিঠের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে একটি কালো দাগ দেখা যায়। (ঘ) পেটের দিকে পঞ্চম থেকে নবম দেহখণ্ডের প্রতি পাশে শুক্র-সংগ্রাহক ছিদ্র (*Spermathecal apertures*) দেখা যায়। (ঙ) চতুর্দশ থেকে যোড়শ দেহখণ্ডকে ঘিরে একটা আবরণ থাকে; এটিকে ক্লাইটেলাম বলা হয়। (১০নং চিত্র দেখ।)

9. আরশোলা (*Cockroach*)ঃ আরশোলা সাধারণতঃ অন্ধকার ভাঁড়ারঘরে এবং চাল ও ডালের গুদামে দেখা যায়। এটি ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত সন্ধিপদ-পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। আরশোলার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যঃ যেমন—(ক) এদের দেহ—মাথা, বুক ও উদরে বিভক্ত। (খ) দেহের উপর একটি কাইটিন-জাতীয় আবরণ থাকে। (গ) এদের বুক-অঞ্চল থেকে তিন-জোড়া পদ থাকে এবং পদগুলি খণ্ড-খণ্ড অংশে বিভক্ত। (ঘ) মাথায় দুটি যৌগিক চোখ দেখা যায় ও চোখের উপরে একটি ক'রে এক-জোড়া শুঁড় দেখা যায়। (ঙ) দুই-জোড়া পাখার মধ্যে প্রথম-জোড়া শক্ত, সেটি দ্বিতীয়-জোড়াকে ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়-জোড়া

পাখা দিয়েই আরশোলা উড়তে পারে। (চ) উদরের শেষাগ্রে দুটি শারসি নামে উপাঙ্গ দেখা যায়। (ছ) উদর-অঞ্চলে আট থেকে দশটি দেহখণ্ড দেখা যায়। (৭৬নং চিত্র দেখ।)

আরশোলাকে কেঁচোর মতো স্পেশিমেন-জারে রেখে, তার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

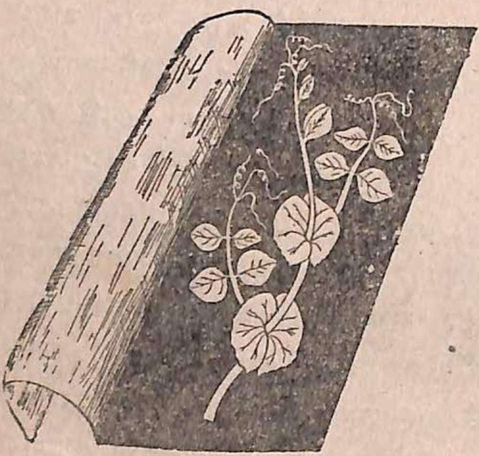
10. রুই মাছ (*Rahu*)ঃ রুই মাছ মিষ্টি-জলে, দীঘি ও পুকুরে বসবাস করে। কর্ডাটা পর্বের মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট পিসেস্ শ্রেণীর প্রাণী। এদের দেহ সাধারণ মাছের মতো। এদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া হ'লঃ যেমন—(ক) মাথা, ধড় ও লেজে দেহটি বিভক্ত। (খ) মাথার করোটি ও দেহে মেরুদণ্ড বিদ্যমান। (গ) ফুলকা-গহ্বরটি কানকো দিয়ে ঢাকা থাকে। (ঘ) দুই চোয়ালের সংযোগ-কোণে একটি ক'রে শুঁড় বা বারবেল (*Barbel*) থাকে। (ঙ) রুই মাছের প্রতিটি বক্ষ-পাখনায় উনিশটি ফিন-রে থাকে। (চ) এদের প্রতিটি শ্রোণী-পাখনায় নয়টি ফিন-রে থাকে। (ছ) পায়ুছিদ্রের পিছনে বেজোড় পায়ু-সংলগ্ন পাখনা থাকে। (জ) রুই মাছের পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের উপর লম্বালম্বিভাবে একটি পৃষ্ঠ-পাখনা থাকে। এটি উন্নত ধরনের এবং এটিতে নয়টি ফিন-রে থাকে। (ঝ) লেজের পাখনাটি বেশ বড় ও সমানভাবে দুইভাগে বিভক্ত। পাখনার মধ্যে লেজ-সংলগ্ন পাখনাই রুই মাছে সবচেয়ে বড়। (ঞ) মাথা বাদে এদের সারা দেহে গোলাকার সাইক্লয়েড আঁশ দেখা যায়।

রুই মাছের বারবেল, পৃষ্ঠ-পাখনা, লেজের পাখনা ও মুখবিবরের গঠন রুই মাছকে চিহ্নিত ক'রে দেয়। (১৮নং চিত্র দেখ।)

11. কুনো-ব্যাঙ (*Toad*)ঃ কুনো-ব্যাঙ আমাদের দেশে সর্বত্র দেখা যায়। পুকুরের ধারে ও জলা জায়গাতেই কুনো-ব্যাঙ বেশী দেখা যায়। এরা কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট উভচর-শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। এদেরও স্পেশিমেন-জারে কাঁচের প্লেটে ফরমালিন দিয়ে ল্যাবরেটরির মিউজিয়ামে রাখা যায়। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—(ক) এরা দেখতে কুৎসিত, চামড়া ঢিলে, বিষাক্ত-গন্ধ-যুক্ত গুটিতে ভরা, এবং পিঠের চামড়া মোটা ও খস্‌খসে। (খ) এদের হাঁ-মুখটি বিরাট। চোখ-দুটি

গোলাকার ও ড্যাব্‌ডেবে। (গ) প্রতিটি চোখের পিছনে একটি ক'রে গোলাকার, পাতলা ও মসৃণ চামড়া থাকে—এটি ব্যাঙের কর্ণপটহ বা কানের পর্দা। (ঘ) কানের পর্দার ঠিক পিছনে একটি ক'রে লম্বাকার, ফোলা প্যারোটিড গ্রন্থি থাকে। (ঙ) হাতে চারটি আঙুল এবং পায়ে পাঁচটি আঙুল থাকে। (চ) পায়ের আঙুলগুলি লিপ্তপদ। অভিব্যক্তিক্রম অনুসারে মাছের পরই ব্যাঙের স্থান। (১৯নং চিত্র দেখ।)

12. মটর গাছের শাখাঃ উদ্ভিদের নানারকমের নরম শাখা, পাতা ও ফুল উদ্ভিদ্‌-সংরক্ষণ-কাগজে (*Herbarium paper*) বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেখে, সেগুলিকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা যায়। উদ্ভিদ্‌-সংরক্ষণ-কাগজের মধ্যে মটর উদ্ভিদের শাখাটি ভালোভাবে মেলে রাখতে হয়। তারপর সেটিকে উদ্ভিদ্‌-সংরক্ষণ-যন্ত্রের (*Plant press instrument*) ভেতর দিয়ে চাপ দিয়ে রাখতে হয়। উদ্ভিদ্‌-সংরক্ষণ-কাগজ উদ্ভিদের নিঃসৃত রস শোষণ ক'রে নেয় এবং উদ্ভিদ্‌টিকে সঠিকভাবে কাগজে আটকে রাখে। এইভাবে অসংখ্য নরম উদ্ভিদ্‌ ও তাদের বিবিধ অঙ্গল সংরক্ষণ ক'রে রাখা হয়। মটর উদ্ভিদের শাখায় কক্ষের পাতার মতো স্টিপিউল বা ফলাকার উপপত্র পরিষ্কার দেখায়। যৌগিক পাতার শেষ তিনটি পত্রক আকর্ষে পরিণত হতেও দেখা যায়।



৯৪নং চিত্র—ভাঁজ-করা ব্লটিং-কাগজের মধ্যে শুষ্ক অবস্থায় একটি মটর গাছের ডাল সংরক্ষণ করা হয়েছে।

প্রশ্নমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী

1. উদ্ভিদ্-জগতের শ্রেণীবিভাগ কি-ভাবে হয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. থ্যালোফাইটা উদ্ভিদ্ কাকে বলে? শৈবাল ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের বিশদ বিবরণ দাও। ছবি এঁকে কয়েকটি উদ্ভিদের উদাহরণ দাও।

3. ব্রাওফাইটা ও টেরিডোফাইটা উদ্ভিদের বিবরণ দাও; এদের মধ্যে কি কি প্রভেদ আছে লেখ।

4. ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রভেদগুলি ব্যাখ্যা কর।

5. উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের একটি সঠিক চার্ট তৈরি কর। প্রতিটি বিভাগের উদ্ভিদের নাম লেখ।

6. শ্রেণীবিভাগ কথার অর্থ কি? কি-ভাবে দ্বিনামকরণ শ্রেণীবিভাগ হয়? একটি উদ্ভিদ্ হতে এবং একটি প্রাণী হতে দুটি জীবের শ্রেণীবিভাগের ধারা লিখে দেখাও।

7. এককোষী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ কর। প্রতিটি শ্রেণীর দুটি ক'রে উদাহরণ দাও।

8. পরিফেরা পর্বের বৈশিষ্ট্য কি? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এর শ্রেণীবিভাগ কর।

9. ট্রিমাটোডা ও সেস্টোডা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লেখ এবং উদাহরণ দাও। কোন্ পর্বে এদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

10. সন্ধিপদ পর্বের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ-সহ শ্রেণীবিভাগ কর।

11. উদরপদী ও মস্তকপদী প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ কি? চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য লেখ।

12. আদি কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যসহ শ্রেণীবিভাগ কর এবং উদাহরণ দাও।

13. উভচর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদভাবে উদাহরণ-সহ বর্ণনা কর।

14. স্তন্যপায়ী শ্রেণীর তিনটি প্রধান উপশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসহ উদাহরণ লেখ।

15. প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের উদাহরণসহ একটি চার্ট তৈরি কর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বহির্গঠন

উদ্ভিদ্

1. মূল কয়প্রকার? বিবিধ প্রকারের মূলের বৈশিষ্ট্য লেখ এবং এরা কি-ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দাও।

2. মূলের বিবিধ অঞ্চল ও তার কাজ লেখ।

3. প্রধান মূলের বিবিধ রকমের পরিবর্তন চিত্রসহ লেখ।

4. অস্থানিক মূলের বিবিধ প্রকারের পরিবর্তন চিত্র ও উদাহরণ-সহ লেখ।

5. কাণ্ডের বিবরণ দাও এবং বিবিধ প্রকারের কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য লেখ।

6. রোহিণী কাকে বলে? নানা ধরনের রোহিণীর বৈশিষ্ট্য উদাহরণ-সহ লেখ।

7. অর্ধ-বায়বীয় পরিবর্তিত কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য লেখ।

8. ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য চিত্রসহ লেখ।

9. কত রকমের পাতা উদ্ভিদ্-জগতে দেখা যায়? উদাহরণ-সহ এদের বিবরণ দাও।

10. পাতা কয়প্রকার? সরল ও যৌগিক পাতার বিবরণ দাও।

11. একটি সরল পাতা এঁকে তার প্রতিটি অংশ চিহ্নিত কর।

12. পাতার বিবিধ পরিবর্তন বর্ণনা কর। অন্ততঃ চারটি ক্ষেত্রে চিত্রসহ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

13. ঘটপত্রী, পাথরকুচি, পাতাঝাঁজি ও বৃন্তপত্রের বিশদ বিবরণ দাও।

14. একটি আদর্শ ফুলের বিবিধ অঞ্চল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

15. নিম্নলিখিত শব্দের মানে লেখ—

অযুক্ত-বৃত্যংশ; অসম; সিনকারপাস; অ্যাপোকারপাস ও উভলিঙ্গ।

16. নিম্নলিখিত শব্দের সংজ্ঞা সংক্ষেপে লেখ—

সমাঙ্গ; অসমাঙ্গ; গর্ভপাদ; গর্ভশীর্ষ; একপ্রতিসম ও পুষ্পপুট।

17. বিবিধ প্রকারের সরল বিদারী ফল চিত্রসহ বর্ণনা কর।

18. গুচ্ছিত ও যৌগিক ফল কয়প্রকার? বিবিধ যৌগিক ফলের বিবরণ দাও।

19. একটি দ্বিবীজপত্রী অসস্যল বীজের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

20. একটি দ্বিবীজপত্রী সস্যল বীজের বহির্গঠন ও অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

21. ভুট্টাদানাকে বীজ না ব'লে দানা বলা হয় কেন? ভুট্টাদানার বহির্গঠন ও অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

প্রাণী

22. নিম্নলিখিত শব্দগুলির মানে লেখ—কলিওরহিজা, কলিওপ্টাইল, কারংকল, হাইপোকোটাইল এবং এপিকোটাইল।

23. রুই মাছের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।

24. ব্যাঙকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয়? একটি ব্যাঙের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।

25. গিরগিটির বহিরাকৃতি বর্ণনা কর।

26. পায়রার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনা ক'রে তার প্রতিটি অঙ্গের কাজ কি তা লেখ।

27. গিনিপিগকে ভিত্তি ক'রে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

28. আরশোলার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

29. প্রজাপতির দেহের ও পাখার বিবরণ দাও; কয়েকটি প্রজাপতির নাম লেখ।

30. শামুকের মুখ ও পায়ের বিবরণ দাও। একটি চিত্র এঁকে শামুকের বিবিধ অংশ চিহ্নিত কর।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বীজের অঙ্কুরোদ্গাম

1. কি কি প্রাকৃতিক অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদ্গাম হয় লেখ।

2. তিনটি মটরের সাহায্যে অঙ্কুরোদ্গামের পরীক্ষা কি-ভাবে করা হয় তার বিবরণ দাও।

3. মৃদ্‌বর্তী ও মৃদ্‌ভেদী অঙ্কুরোদ্গমের প্রণালী বর্ণনা কর।

4. 'জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গাম' কাকে বলে? চিত্র ও উদাহরণ-সহ বিবরণ দাও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থকরী উদ্ভিদ্ ও প্রাণী

1. ধান কয়রকম? কখন, কোন্ সময়ে কোন্ রকমের ধান চাষ করা হয়?

2. গম কোন্ সময়ে চাষ করা হয়? কত রকমের গম ভারতে চাষ হয়? গম থেকে কি কি দ্রব্য তৈরি হয়? একশো গ্রাম গম ও চালের মধ্যে কি কি খাদ্য-ক্যালরি থাকে লেখ।

3. রবিশস্য বলতে কি বোঝায়? রবিশস্য কয়প্রকার? প্রতিটি রবিশস্যের বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ।

4. পাটের সঙ্গে সোনার তুলনা করা হয় কেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

5. তুলো কোথায় উৎপন্ন হয়? কয়প্রকার তুলো-উদ্ভিদ্ আমাদের দেশে আছে? তুলোর উপকারিতা কি কি?

6. শাল কাঠের বৈজ্ঞানিক নাম কি? পশ্চিমবঙ্গে শাল কাঠ কোথায় পাওয়া যায়? কি কি কাজে শাল কাঠ ব্যবহার করা হয়?

7. সরিষা কোথায় ও কি-ভাবে চাষ করা হয়? সরিষার উপকারিতা লেখ।

8. পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় রেশম মথের চাষ হয়? রেশম মথ কয়-প্রকার? এরা কি-ভাবে রেশম তৈরি করে?

9. "মাছ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য"—এটি ব্যাখ্যা কর ও পুকুরে মাছ চাষ করতে হলে, কি কি করণীয় তা লেখ।

10. মাছের বিবিধ ব্যবহার লেখ।

11. কত জাতের হাঁস আমাদের দেশে পালন করা হয়? সাধারণ হাঁসগুলির বর্ণনা কর। একটি হাঁসের ডিমে কি কি গুণাগুণ ও খাদ্যপ্রাণ থাকে লেখ।

12. মুরগীর মধ্যে চাটগেঁয়ে মুরগী, ব্ল্যাক-মিনর্কা ও নিউ-হাম্পশায়ার জাতের মুরগীর বিবরণ দাও। একটি মুরগীর ডিমে কি কি গুণাগুণ ও খাদ্যপ্রাণ থাকে লেখ।

13. গোরুকে আমরা 'মাতা' বলি কেন? গোরুর উপকারিতা বর্ণনা কর। ষোল আউন্স গোরুর দুধে কি কি পদার্থ পাওয়া যায়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খাদ্য

1. স্নেহ-পদার্থে কি কি রাসায়নিক পদার্থ থাকে? বিবিধ প্রকারের স্নেহ-পদার্থ শ্রেণীবিভাগ ক'রে বর্ণনা কর। স্নেহ-পদার্থের উপকারিতা কি কি?

2. শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য কত রকমের পাওয়া যায়? এর উপকারিতা কি কি? প্রোটিনের সঙ্গে এর তুলনা কর।

3. প্রোটিনে কি কি রাসায়নিক পদার্থ থাকে? নিম্ন ও উচ্চ প্রোটিনের মধ্যে প্রভেদ কি? প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনের মধ্যে তুলনা কর।

4. প্রোটিনের কাজ কি? প্রোটিনকে 'দেহ-গঠনকারী ইষ্টক' বলা হয় কেন?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ঔষধের কাজে উদ্ভিদ্ ও ক্ষতিকারক প্রাণী

1. ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। পেনিসিলিয়ম উদ্ভিদের বর্ণনা কর।

2. পেনিসিলিয়মের আবিষ্কার কে, কি-ভাবে ও কবে করেছিলেন বর্ণনা কর। এর উপকারিতা কি কি লেখ।

3. ধুতুরা উদ্ভিদের উপকারিতা কি? উদ্ভিদটির বর্ণনা কর। 'ডাটুরিন' কাকে বলে?

4. সর্পগন্ধা ভারতে কোন্ কোন্ স্থানে চাষ করা হয়? এর চাষের পদ্ধতি কি?

5. সর্পগন্ধায় কি কি উপক্ষার পাওয়া যায়? উপক্ষারগুলির বিশদ বর্ণনা দিয়ে এদের উপকারিতার বিষয়ে লেখ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

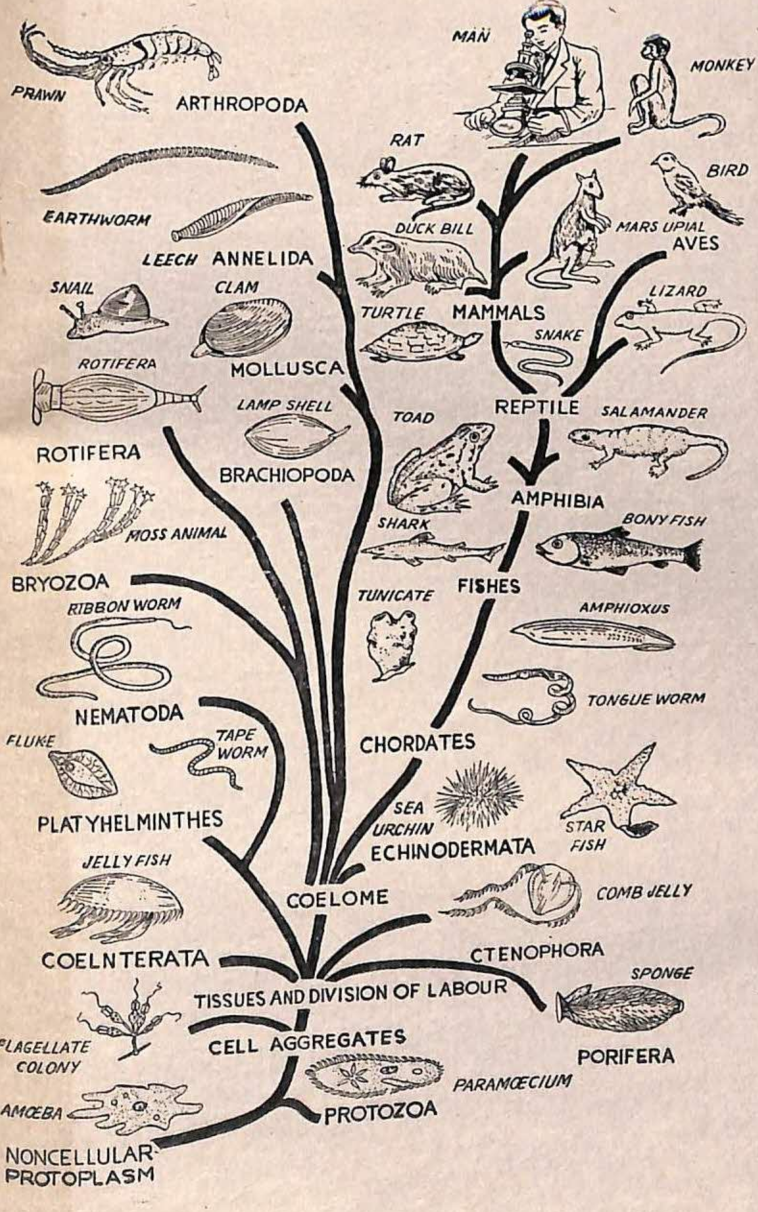
পর্যবেক্ষণ

1. ছবি এঁকে একটি অ্যামিবা ও একটি কুঁড়ি-সহ হাইড্রাকে চিহ্নিত কর।

2. নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্গুলিকে কি-ভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লেখ: (i) ঈস্ট, (ii) স্পাইরোগাইরা, (iii) মিউকোর, (iv) মস্, (v) ফার্ন।

3. নিম্নলিখিত প্রাণীগুলির চিহ্নিতকরণ প্রণালী ও তাদের কয়েকটি গুণাগুণ লেখ: (i) কেঁচো, (ii) আরশোলা, (iii) রুই মাছ, (iv) কুনো-ব্যাঙ, (v) গিরগিটি।

4. পায়রা ও গিনিপিগের চিহ্নিতকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর।



MAN
MONKEY
PRAWN
ARTHROPODA
RAT
BIRD
EARTHWORM
DUCK BILL
MARS UPIAL
AVES
LEECH
ANNELIDA
SNAIL
CLAM
LIZARD
TURTLE
MAMMALS
SNAKE
ROTIFERA
MOLLUSCA
LAMP SHELL
TOAD
REPTILE
SALAMANDER
ROTIFERA
BRACHIOPODA
AMPHIBIA
MOSS ANIMAL
SHARK
BONY FISH
BRYOZOA
TUNICATE
FISHES
RIBBON WORM
AMPHIOXUS
TONGUE WORM
NEMATODA
FLUKE
TAPE WORM
CHORDATES
PLATYHELMINTHES
SEA URCHIN
STAR FISH
ECHINODERMATA
JELLY FISH
COELOME
COMB JELLY
COELNTERATA
CTENOPHORA
SPONGE
TISSUES AND DIVISION OF LABOUR
CELL AGGREGATES
FLAGELLATE COLONY
PORIFERA
PARAMŒCIUM
AMŒBA
PROTOZOA
NONCELLULAR PROTOPLASM